بسم الله الرحمن الرحيم

শাহাদাতের তাৎপর্য ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার বলেন ঃ

قتل حسین در حقیقت مرگ یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہرکربلاکے بعد

"ইমাম হোসাইনের শাহাদাত এজিদের মৃত্যু সুনিশ্চিত করে। প্রতি কারবালার পর পুনঃবার ইসলাম সঞ্জীবিত হয়।"

ব্যাপক অর্থে ইমাম খোমেনী বলেন ঃ

كل ارض كربلا - كل يوم عاشوراء

কুল্লু আরদিন কারবালা–কুল্লু ইয়াউমিন আশুরা "সকল ভূখণ্ডই কারবালা –সকল দিবসই আশুরা।"

সূচী

★ পূর্বকথা ৭
★ সাহাবা প্রসঙ্গ ৯
★ সর্বাবস্থায় সাহাবাদের অভিমত শরীআতের প্রমাণ নয় ১১
★ ব্যক্তিত্রয়ের জন্য সকল সাহাবা দায়ী নয় ১৪
★ ব্যক্তিত্রয় সম্পর্কে হযরত হাসান বছরী বলেন ১৪
★ ন্যায়ের নির্দেশ ও অন্যায়ে বাধা দান প্রসঙ্গ ২০
★ ইমাম হোসাইনের মর্যাদা ২৯
★ ঘাতক উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পরিণাম ৩২
★ কারবালায় ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের লক্ষ্য ও তাৎপর্য ৩৫
★ হোসাইনী সংগ্রামের উদ্দেশ্য ৩৯
★ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইবনু হানাফিয়্যার নিকট–
ইমাম হোসাইনের লিখিত বাণী ৪০
★ ইমাম হোসাইনের জিহাদের ব্যাখ্যায় শাহ আঃ আযীয দেহলবী (রঃ) ৪২
★ সংগ্রামের কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় এজিদ বাহিনীর সামনে–
ইমাম হোসাইনের ভাষণ ৪৪
★ মহৎ কাজে বাঁধা আসে ৪৭
★ শুভাকাঙ্খীদের বিনয় নিবেদন ৪৯
★ ইবনে উমর ৫১
★ ইবনে আব্বাস ৫২
★ ইবনে যোবাইর ৫৩
★ ইবনে আব্বাসের পুনরাগমন ৫৪
★ এসব যুক্তির জবাবে ইমাম হোসাইন বলেন ৫৪
★ উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের নিকট এজিদের পত্র ৫৬
★ উমাইয়া শাসনামলের বিদআতসমূহ ৫৮
★ হযরত আমীর মুআবিয়ার প্রবর্তিত বিদআতগুলো উল্লেখ করে বলা হয় ৫৮

★ উমাইয়া শাসন আমল খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত ছিল না বলে–
উল্লেখ করে বলা হয় ৬০
★ হযরত আমীর মুআবিয়া খলীফা ছিলেন না, বাদশাহ্ ছিলেন ৬১
★ ছাহেবে হেদায়ার দৃষ্টিতে হযরত আমীর মুআবিয়া (রহঃ) ৬৪
★ হযরত আয়েশা, যোবাইর, তালহা প্রমুখ নির্দোষ ছিলেন ৬৮
★ এজিদ প্রসঙ্গ ৭৩
★ এজিদের না হক ফরমান জারি ৭৫
★ এজিদী অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া ৭৮
★ এজিদী কুম্ভীরাশ্রু ৭৯
★ এজিদ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) ৮৩
★ এজিদ কাফির ও মালাউন ছিল বলে উলামাদের বক্তব্য ৮৪
★ মহাবনী (সঃ)–এর বংশের আবমাননাকারী অভিশপ্ত ৮৬
★ এজিদের প্রতি লাআনাত প্রেরণের সর্বসম্মত উপায় ৮৭
★ কর্তিত শিরের মর্মান্তিক মিসিল ৮৯
★ কর্তিত শির মোবারকের সাথে এজিদের অবমাননাকর আচরণ ৯১
★ এজিদ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত জামাতের অভিমত ৯৪
★ এজিদ প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসীর অভিমত ৯৭
★ এজিদ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবীর (রঃ) অভিমত ১০০
★ ইমাম হোসাইনের শাহাদতের ব্যাপারে সন্দেহ নিরসন ১০১
★ জনাব আমীর মুআবিয়ার সৎ নিয়ত ১০৫
★ এজিদের জন্য আগাম বায়আতের বিবরণ ১০৯
★ হযরত আমীর মুআবিয়ার বিতর্কিত ভাষণ ১১৫
★ স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় ইমাম হোসাইন ১১৭
★ ইরাক অভিমুখে ইমাম হোসাইন ১১৯
★ মুসলিম ইবনু আকীলের শাহাদাত ১২২
★ মুসলিম ইবনু আকীলের নিহত হওয়ার সংবাদ ১২৪
★ ইবনু যিয়াদের সামনে মুসলিম ইবনু আকীলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ১২৫
★ ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে–
মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ)–এর বক্তব্য ১২৬

নযরানা

কারবালায় ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথে
শাহাদাত বরণকারী পূণ্যবান শহীদানের প্রতি
নযরানাস্বরূপ এ নগণ্য প্রয়াস।

–গ্রন্থকার

নবী পরিবারের মহব্বত ঈমানের অংশ

.... حب اهل بیت اظهار جزوایمان هے ان پر وحشیانه مظالم کی داستان بهلانے کے قابل نهین -

حضرت حسین (رض) اور ان کے رفقاء کی مظلوما نه اور درداتگیز شهادت کا واقعه جس کے دل مین رنج وغم اور دردِ پیدا نه کرے وه مسلمان کیا انسان بهی نهین -

(شهید کر بلا ص۸ .۱)

পবিত্র নবী পরিবারের মহব্বত ঈমানের অংশ। তাঁদের উপর কৃত অমানুষিক জুলুমের কাহিনী ভুলে যাওয়ার মতো নয়।

হযরত হোসাইন (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের নিপীড়নমূলক ব্যথাতুর ঘটনা যার অন্তরে ব্যথা বেদনা ও শোকের ছায়াপাত না করে সে মুসলমানতো নয়ই, মানুষও নয়।

মুফতী মোহাম্মদ শফী (রঃ)
(শহীদে কারবালা ঃ ১০৮ পৃষ্ঠা)

পূর্বকথা

আল্লাহ্‌র হামদ ও সানা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠের পর গ্রন্থের শুরুতেই শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইনের প্রতি নিবেদন করি হাজারো সালাম। কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইনের ভূমিকা ইতিহাসের একটি বিরল ঘটনা। এ মহান ব্যক্তির দৃষ্টান্ত তিনি নেজেই। অন্য কোথাও তাঁর নযির খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সত্যের জন্য তাঁর সংগ্রাম সাধনা কলমের কালো কালিতে লেখা যায় না। লিখতে হয় আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করতে গিয়ে বুকের রক্তিম শোণিত ধারায়। মর্দে মুজাহিদগণ সে ভূমিকা রক্তের লাল কালিতে লিখে চলেছেন এজিদের রণাঙ্গনে। ইসলামী বিধান বিলুপ্ত হতে চলেছিল নামধারী কিছু মুসলমানের হাতে। তারা ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বৈরাচারীর বিষাক্ত ছোবল মেরে চলছিল দুরভিসন্ধিমূলক পাঁয়তারা এঁটে। ইসলামের মহান ব্যক্তিবর্গও মুখ খুলতে পারছিলেন না। তখন ইমাম হোসাইন অগ্রসর হন এবং বাতিলকে চ্যালেঞ্জ করেন। স্বীয় বীরত্বে হতবাক করে দেন তিনি ইতিহাস পাঠককে। দুর্বল-হৃদয় ব্যক্তি পাশ কেটে চলে যেতে চায়। আর হযরত ইমাম হোসাইন বুক পেতে জালিমের আঘাত নিতে বেরিয়ে আসেন। ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় তাঁর নূরানী দেহ এজিদের জালেম বাহিনীর অসির আঘাতে। অশ্ববাহিনী দাবড়িয়ে দিয়ে দলিত মথিত করে তাঁর পবিত্র দেহ এজিদের সেনারা। আজো, ইসলামের পথে এরূপ নির্যাতন ভোগ করার জন্য নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাত। শাহাদাত মানেই সত্যের সাক্ষ্য দান। সত্যকে বিলুপ্ত করে দেয়ার এজিদী প্রয়াসকে ব্যর্থ করে যান ইমাম হোসাইন অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে। অস্ত্রবল, জনবল ও পার্থিব উপকরণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কিরূপে বাতিলের মুকাবিলা করা যায় ইমাম হোসাইন শাহাদাত বরণ করে সে পথ দেখিয়ে গেছেন। বিশ্বমানবতা বিস্ময়ভরে তাকিয়ে দেখেছে কারবালায় ইমাম হোসাইনের বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য। বস্তুতঃ এরূপ নির্ভীক ব্যক্তিরাই উন্নত মানবিক সত্তাকে টিকিয়ে রেখেছেন ইতিহাসে। সার্থক করে তুলেছেন মানব জীবন।

হযরত ইমাম হোসাইন এক্ষেত্রে একজন অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। আমরা এখানে তাঁর চরিত্রের নানা দিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আর তাঁর সংগ্রামে কালিমা

লেপনকারীদের কিছু অপ-প্রচারণার জবাব তথ্যনির্ভর বক্তব্যে উপস্থিত করেছি। আশা করি, পাঠক মহোদয় এতে কিছুটা চিন্তার খোরাক পাবেন। এমন বহু নির্ভিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন যাঁরা ইমাম হোসাইনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। অকুতোভয়ে জালিমের নির্যাতনের মোকাবিলা করবেন। প্রয়োজনে প্রতিঘাত করবেন। সুরক্ষিত দূর্গে বসেও যেন জালিম সত্যের সৈনিকদের ভয়ে কম্পমান থাকে। আজ বিশ্ব মুসলিমের স্বার্থে খেলাফত পদ্ধতির ইসলামী রাষ্ট্রের আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিচ্ছিন্ন মুসলিমদেশ গুলোর পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে এক খলীফার হুকুম মেনে চলার ব্যবস্থা নিতে হবে। বশংবদ কর্ণধারদেরকে সরিয়ে দিতে হবে। এজন্যও ইমাম হোসাইনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে। সংহতি ও সমঝোতা আসতে হবে বিশ্বময় ইসলামী আন্দোলনগুলোর মধ্যে। ইমাম হোসাইনের আন্দোলনে এ বিষয়ে ইংগিত রয়েছে।

পরিশেষে বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশনের প্রশংসা অবশ্যই করতে হবে। বিপুল গ্রন্থাদির সমারোহ ইঃ ফাঃ গ্রন্থাগারে। যা থেকে বই লেখার কাজে আমি নিজে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। ফাউন্ডেশনকে জানাই বিশেষ মোবারকবাদ। আর বন্ধুবর ইসলামী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেবক আঃ মান্নান তালিব সাহেবকে স্মরণ করি। তিনি বইটি সম্পাদনা করেছেন।। অংগশ্রী বৃদ্ধি করেছেন। অতঃপর পাঠকদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে মূল বক্তব্য পেশ করছি।

মোহাম্মদ ছামির উদ্দিন গাজীপুরী
গাজীপুর, ৩০ মহররম ১৪১৬ হিজরী

সাহাবা প্রসঙ্গ

ন্যায় ও অন্যায়ের তফাত বুঝাতে হলে অনিবার্যভাবেই অন্যায়ের মুখোশ উন্মোচন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এখানে ব্যক্তিসত্তার দোহাই অচল। সাহাবাকিরাম –রাযিয়াল্লাহু আনহুম–ছিলেন মানবমন্ডলীর অন্যতম অসাধারণ মণীষীবর্গ। তবু তাঁরা ভুল ত্রুটি বিমুক্ত–মাসুম– ছিলেননা। তাঁরা কলহ বিবাদ করেছেন। মামলা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন। কোন কোন সাহাবী ছোট বড় গুণাহের কলুষ কালিমা এড়িয়ে যেতে পারেননি। কারণ, তাঁরা মানব (বাশার) ছিলেন, 'অতি মানব' ছিলেন না। বাশার –খাসলৎ তথা মানবীয় দুর্বলতার উর্দ্ধে তাঁরা ছিলেননা। তাদের ইজতিহাদীস্খলন ও বিচ্যুতি ইসলামের দলীল নয়। বিশেষতঃ কোন ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মত ও পথের বিভিন্নতা দেখা গেলে দলীল প্রমাণের সাহায্যে যে মতের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর হবে সেটিই গ্রহণ করতে হবে। এটাই হযরত ইমাম আবু হানিফা–রাহমাতুল্লাহি আলায়হি –এরঅভিমত।[১] আর এমূলনীতি মেনে চলেছেন উম্মতের ফকীহগণ।[২]

ঘটনার বিশ্লেষণেও মাস্লা–মাসায়েলের ব্যাখ্যায় সাহাবা প্রসঙ্গ আলোচনা করা যায়। প্রয়োজনে তাদের ভুলত্রুটি ও বিচ্যুতি বর্ণনা করা যায়।[৩] এ দৃষ্টিতেই জনাব আমীর মুআবিয়া (রাঃ) কে হযরত আলী (রাঃ)–এর বিরুদ্ধাচরণ করার দরুণ 'বাগী' (বিদ্রোহী) বলেছেন আহলেসুন্নাত পন্থী ইমামগণ ও বিজ্ঞ উলামায়েকেরাম।[৪] পাঠকবর্গ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)–এর এমদাদুল ফাতওয়া ৪র্থ খন্ড ৭০ পৃষ্ঠা। টীকা নম্বর ৩, প্রসঙ্গে) হযরত মাওলানা শাহ আঃ অযীয (রঃ)–এর তোহফা–ই–ইসনা আশরিয়া ৩৫৪,৩৫৬,৫১৮ পৃষ্ঠা,টীকা ৪ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের ২য় খন্ড, ১০৪৯ পৃঃ হাশিয়া নং ৪–৫ দেখে নেবেন। এখানে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

কাজেই আমরা এজিদ প্রসঙ্গে ইতিহাস আলোচনায় কোন কোন সাহাবীর আচরণ উল্লেখ করতে বাধ্য হব। কতিপয় সাহাবীর আপত্তিকর আচরণের দরুণই ইসলামের ইতিহাসকে কলংকিত করার সুযোগ পেয়েছিল পাপাচারী এজিদ। এজিদ নবী (সঃ)–এর সাহাবী ছিলনা। কাজেই তার ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করতে বাধানেই। তবে তার প্রসঙ্গে জড়িত কতিপয় সাহাবীর কথা নিতান্তই ঐতিহাসি ঘটনা প্রবাহের পরম্পরা রক্ষার্থে আলোচনা করতে হচ্ছে, যা বৈধ।[৫] এবিষয়ে উলামা ই কেরাম লেখককে সত্য–নিষ্ঠার দোষে দোষী করলেও কিছু করার নেই।

সাহাবাদের কলহ বিবাদ এমনকি যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে বলা হয় যে, এসবই

'ইজতিহাদী গালতি' ছিল। কোন কোন অতিজ্ঞানী ব্যক্তি বলে থাকেন এসব করে নাকি তাঁরা ছাওয়াবের অধিকারী হয়েছেন। এরূপ জ্ঞানীরা ভুলে যান যে যেখানে নস্‌সেসারী[৬] কুরআন হাদীসের স্পষ্ট-উক্তি থাকে সেখানে ইজতিহাদ অচল। এরূপ স্থানে ইজতিহাদ করাই বৈধ নয়। ছাওয়াব পাওয়ার ধারণা পোষণ করাতো একেবারেই অবাস্তব।

অবশ্য ছাওয়াব দেয়া নাদেয়া আল্লাহর কাজ। খোদার উপর কেউ 'খোদকারী' করার অধিকার রাখেনা। তিনি ছাওয়াব দিলে দেবেন। আর প্রাপকেরা তা পেয়ে যাবে। এটা নিয়তের ব্যাপার। কিন্তু কোন কোন সাহাবীর আচরণে ইসলামের ইতিহাসে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল তার ক্ষতিকর বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইসলামের খলীফা নির্বাচনের শাশ্বত নীতি লংঘন করে এজিদকে ছলেবলে ক্ষমতায় বসানোর কসরত করেছিলেন কতিপয় ব্যক্তি। যার পরিণামে ঘটেগেল কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা। ঝরে পড়ল নবী পরিবারের নিষ্পাপ শিশুদের ফুলের ন্যায় দেহকান্তি। জালিমরা অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখালো হৃদয়হীন নির্মম হত্যাকান্ড মঞ্চস্থ করে কারবালার ময়দানে। লুণ্ঠিত হল নবী পরিবার। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার অব্যবহিত পর-এজিদ সেনাদের হাতে সতীত্ব হারালেন পবিত্র মদীনার পর্দানশীল মহিলারা হাররা নামক সমরে।[৭] এজিদ বাহিনী অগ্নিসংযোগ করল কাবাঘরে। পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্র বসিয়ে পাথর ছুঁড়ে চৌচীর করে দিল কাবাঘরের ন্যায় পবিত্র গৃহটি।[৮] এসবকি মুসলমানের কাজ? ধর্ষণকারী, লুণ্ঠনকারী, অগ্নি সংযোগকারী ছিল তারা। এমনকি সেসময় মদীনার মসজিদে নববীতে[৯] নামাজ পর্যন্ত পড়তে দেয়নি এজিদের লোকেরা। তারাও নামাজ পড়েনি। নবীর মসজিদে অশ্ববাহিনীর স্থান করে দিয়ে এ পবিত্র মসজিদটিকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করল এজিদের সেনারা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এজিদকে বসানো না হলে এসব কিছুই হত না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে সে একাজের ছাওয়াব পায়। আর যারা এ পথে চলে পুণ্যের অধিকারী হয় তাদের সমতুল্য ছাওয়াবেরও সে অধিকারী হয়। এতে বিন্দুমাত্র পুণ্যকারীদের ছাওয়াব কমেনা আর যে মন্দ প্রথা প্রবর্তন করে সেকাজের পাপের বোঝা তার প্রাপ্য এবং ওই প্রবর্তিত পথে চলে যারা পাপ করে তাদের সকলের পাপের সমতুল্য পাপের বোঝাও এরূপ কু প্রথা প্রবর্তনকারীকে বইতে হবে।"[১০] এ হাদীসের প্রেক্ষিতে যারা এজিদকে অবৈধভাবে মসনদে বসিয়েছিল তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া যায়না। কাজেই হোসাইন প্রসঙ্গ এলে এজিদের কথা এসে যাবে। আর তাকে যাঁরা মসনদে বসিয়ে ছিলেন প্রসঙ্গত তাঁদের কথাও এসে যাবে। ঘটনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণে এরূপ পরিস্থিতি এড়ানো যাবেনা। আর

بعدك قال : او قد فعلت قال نعم، قال ارجع الى عملك فلما خرج قال له اصحابه مادراءك؟ قال وضعت رجل معاوية فى غرز غىّ لايزال فيه الى يوم القيامة - قال الحسن : فمن اجل ذالك بايع هؤلاء لانبائهم ولولا ذالك لكانت شورى الى يوم القيامة -

(تاريخ الخلفاء ص ١٩٢)

"হযরত হাসান বছরী বলেছেন ঃ মুসলমানদের জীবন ব্যবস্থায় দু ব্যক্তি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। প্রথম ব্যক্তি আমর ইবনুল্ আস। যেদিন তিনি মুআবিয়াকে পরামর্শ দিলেন যে কুরআন বর্শার উপর উত্তোলন কর। সেদিন কুরআন উত্তোলন করা হল।[১১-১] আর মুআবিয়া কুরআন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে হত্যা করলেন। ফলে খারিজীরা–ইনিল্ হুকমু ইল্লা লিল্লাহ–আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানিনা। ধ্বনি তুললো। এ ধ্বনি কিয়ামত তক উঠতে থাকবে।[১১-২]

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন মুগীরাহ ইবনে শো'বা। তিনি মুআবিয়ার পক্ষ থেকে কূফায় শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুআবিয়া তাঁকে লিখে পাঠানঃ তুমি আমার পত্র পাঠমাত্র ক্ষমতাচ্যুত হয়ে চলে এসো। এ নির্দেশ পালনে মুগীরা বিলম্ব ঘটান। দেরিতে মুআবিয়ার নিকট উপস্থিত হন। মুআবিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ দেরিতে পৌছার কারণকি? মুগীরা বলেনঃ একটি কাজ আমি প্রাথমিক পর্যায়ে আরম্ভ করি এবং তা বাস্তবায়নে মনোযোগদেই। মাআবিয়া বলেনঃ তা কি? মুগীরা বলেন। আপনার পর এজিদকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য বায়আত গ্রহণ। মুআবিয়া বললেন ঃ তুমিকি তা করেছো? মুগীরা বললেন অবশ্যই। মুআবিয়া বললেনঃ তুমি তোমার পদে বহাল হয়ে ফিরে যাও। মুগীরা যখন মুআবিয়ার নিকট হতে বের হয়ে আসলেন তখন তাঁকে তাঁর সাথীরা প্রশ্ন করলঃ পেছনের খবর কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ আমি মুআবিয়ার পা ভ্রষ্টতার পাদদেশে রেখে এসেছি। কিয়ামত পর্যন্ত সে তাতে ফেঁসে থাকবে।

হাসান বছরী বলেনঃ এজন্যে এসবলোকেরা নিজেদের সন্তানাদির জন্য বায়আত নিয়েছে। এ কাজ না করলে বায়আত কিয়ামত পর্যন্ত শুরার মাধ্যমে হত।[১২] (তারীখুলখোলাফা ১৯২ পৃষ্ঠা)

হযরত হাসান বছরী একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সন্তানাদির জন্য অগ্রিম বায়আত সংগ্রহ করা বা পিতার পর ছেলেকে স্থলাভিষিক্ত করাকে শুরাই ব্যবস্থার পরিপন্থী বলেছেন। এ বেদআত জারী হয় মুগীরা ইবনু শোবার (রাঃ) পরামর্শে।

একে রাষ্ট্রীয় রূপদান করে যান জনাব আমীর মুআবিয়া। উম্মতকে এরূপে তিনি বিনাশ করে যান। আর প্রথমে যে ব্যক্তি বিনাশ করেন তিনি ছিলেন আমর ইবনুল আস। আমর ইবনুল আসই প্রতারণামূলক কৌশল অবলম্বন করে সিফফীন যুদ্ধে কূটনীতি ও অসৎ রাজনীতি করার পরামর্শ দেন। আর আমীর মুআবিয়া তালুফে নিয়ে বর্শার আগায় কুরআন বিদ্ধ করে হযরত আলীর সেনাদলের অতি ধার্মিক একটি অংশকে বিভ্রান্ত করেন। ইতিহাসে তাদেরকে খারিজী সম্প্রদায় বলা হয়। তারা হযরত আলীর বৈধ খেলাফতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে উম্মতের মধ্যে অনৈক্য বৃদ্ধি করে। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা বুঝতে পারেনা কুরআনের সাথে কি ব্যবহার করবে। ফলে এমন সময় তারা রণে ভংগ দেয় যখন জয় তাদের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। এমনকি তারা হযরত আলীর নির্দেশও অমান্য করে। তাঁকেও মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ইত্যবসরে মুআবিয়ার ফৌজ বহু কুররাকে হত্যা করে বলে হাসান বছরী বলেন।

পরবর্তী বছর দাউমাতুল্ জান্দালে[১২-১] সালিশ বৈঠক বসে। এ বৈঠকে হযরত আলীর (রাঃ) পক্ষহতে হযরত আবু মুসা আশ্আরী এবং হযরত আমীর মুআবিয়ার পক্ষ হতে ধুরন্ধর আমর ইবনুল আস প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তিনি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সালিশী বৈঠক ব্যর্থ করেদেন এবং একতরফভাবে হযরত আমীর মুআবিয়াকে খলীফা ঘোষণা করেন। ফলে গোলযোগ বেঁধে যায়। আর হুড়াহুড়ির মধ্যদিয়ে সভা পন্ড হয়ে যায়। এসব কলংকময় ব্যাপার আমর ইবনুল আস ঘটান। আর আমীর মুআবিয়া ফায়দা লুটতে থাকেন অন্যায়ভাবে। এসবকি ওয়াদা খেলাফীতে পড়ে না? কৃতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করা কি ইসলামের নীতি? এসব বৈধ করে নিয়ে ছিলেন উমাইয়্যা যুগের শাসকরা। যাদের মধ্যে হযরত আমীর মুআবিয়াও রয়েছেন। এটাওকি ইজতিহাদী ভ্রম? কুরআনে আছে وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا "কানায় কানায় পূর্ণ করে পালনকর প্রতিশ্রুতি সমূহ। নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে।"[১৩] এ ব্যাপারে ফিক্হবিদগণ একমত যে, স্পষ্ট নির্দেশের বিপরীত ইজতিহাদ অচল।[১৪] কাজেই যারা ধূর্তামীর আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের রক্তপাতের কারণ সৃষ্টি করেছেন রোজ হাসরে তাঁদের বিচার হবেই। এখানে ইজতিহাদের দোহাই চলবেনা। তাই বলা যায় ইসলামের ইতিহাসে সকল সাহাবী অন্যায় করেননি। অন্যায় করেছেন মাত্র তিন জন শ্যামীর মুআবিয়া, আমর ইবনুল আস ও মগীরা ইবনু শো'বা। এরাই রাজনৈতিক অশান্তির মূলে রয়েছেন। কাতলে খাতার অধ্যায়ে দেখা যায় কতলকারীর প্রাণদন্ড হয় না। তাই বলে দিয়্যত'–রক্ত পণ–অবশ্যই দিতে হয়। কাজেই উক্ত তিনজন সাহাবী দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন বলে নিশ্চিৎ উক্তি করা যায় না।

ইমাম হোসাইনের শ্লোগান

شعارهای ابا عبدا الله شعار احیای اسلام است : اینست که چرا بیت المال مسلمین رایك عده به خودشان اختصاص داده اند؟ چرا حلال خدارا حرام، وحرام خدارا حلال می کنند؟ چرا مردم را دو دسته کرده اند مردمی که فقیر فقیر ودرد مندند ومردمی که از پرخوري نمی تنوانند از جایشان بلند شوند ؟ (مرتضی مطهری)

—ইমাম হোসাইনের শ্লোগান ছিল ইসলাম পুনর্জীবিত করার শ্লোগান। তাছিল ঃ মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার কতিপয় লোকে কেন কুক্ষিগত করে রাখবে? কেন আল্লাহর হারামকে হালাল ও আল্লাহর হালালকে হারামে পরিণত করা হবে? কেন জনগণকে দু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে? একশ্রেণী চরম দরিদ্র হবে দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে। আর এক শ্রেণী অতি ভোজনের দরুণ ভুরি ভারে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

'মুর্তাজা মুতাহহারী'

حماسه حسینی : ج۲ ص۲۲۲

ন্যায়ের নির্দেশ ও অন্যায়ে বাধাদান প্রসঙ্গ

মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে ইসলামের একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করতে হয়। আদর্শ চিরঞ্জীব ও সতেজ থাকে আদর্শ বিরোধী তৎপরতা প্রতিহত করা হলে। অন্যায় আস্কারা পেলে ন্যায়নীতি ব্যাহত হয়। দুর্গন্ধের মাত্রা বেড়ে গেলে খুশবুর মিষ্টি সুবাস কমে যায়। একপর্যায়ে এসে নিঃশেষও হয়ে যায়। তখন পরিবেশ পুতিগন্ধময় হয়ে ওঠে। এমন পরিবেশে টিকে থাকা যায় না। কাজেই দুর্গন্ধের কারণ দূরীভূত করতে হবে। সমাজ ও পরিবেশ নিষ্কলুষ করে বাসোপযোগী করতে হবে। অনুরূপ অন্যায়ের মাত্রা বেড়ে গেলে সমাজে বসবাস করা দুরূহ হয়। কাজেই অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং ন্যায় পরায়নতার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এটাকে বলা হয় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। আর এরূপ কর্ম সম্পাদনকে ইসলামের পরিভাষায় 'আমরবিল মারূপ ও নাহি আনিল মুনকার' বলে। বস্তুতঃ ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্যই নবী রসূলের আগমন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ اَخ - (الحديد ٥٦)

"আমরা আমাদের রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়ে পাঠিয়েছি। আর তাদের সাথে গ্রন্থ ও ন্যায় নীতি পরিমাপযন্ত্র নাযিল করেছি। যেন লোকেরা ইন্সাফ প্রতিষ্ঠিত করে।"[১]

এখানে নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করা হয়েছে। মানব সমাজে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করাই নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য। কাজেই পৃথিবীতে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠিত করা না হলে নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। মর্তে যখন অন্যায় পুরাপুরি ভাবে প্রাধান্য বিস্তার করবে তখনই মহা প্রলয় কিয়ামত কায়েম হবে। তখন পৃথিবী টিকিয়ে রাখার কোন সার্থকতা থাকবেনা। আর পৃথিবীতে ন্যায়নীতি কায়েম রাখার জন্যই উম্মতে মুহাম্মাদীর আগমন। এ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ..... (ال عمران ١١٠)

-"তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা

বলার দরুন এঁদেরকে বেঁধে হত্যা করেছিল। এছাড়া যুদ্ধের ময়দানে উমাইয়্যা জালিম শাসকদের হাতে অগনিত মানুষ প্রাণ হারায়।

আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্‌কারের কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

لَوْلاَ يَنْهٰى هُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ - (المأيده ٦٣)

"আল্লাহ-ভক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং আলেমগণ কেন তাদেরকে মিথ্যা কথা বলা হতে এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ ভোগ করা হতে বিরত রাখেনা? তারা অত্যন্ত মন্দ আচরণ করে থাকতো।"[১০]

সমাজ জীবনে ধ্বস্ নামার দু'টিপথ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্যঃ মিথ্যাচার ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন। যাকে 'সুহ্‌ত' বলা হয়েছে। ধর্মভীরু ও আলেম শ্রেণীর কর্তব্য হলো এসব বিপথগামিতা হতে লোকজনকে বিরত রাখা। উমাইয়্যা শাসন আমলে এসব দুষ্কর্ম অবাধে চলতে থাকে। অত্যাচারের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেতনা । এমতাবস্থায় হযরত শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইন প্রতিবাদ কণ্ঠ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ মুমিনের কাজই হল সৎ কাজে নির্দেশ দান এবং অসৎ কাজে বাধাদান করা।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ - (توبه ٧١)

—"মুমিন নর-নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা ন্যায়ের নির্দেশ এবং অন্যায়ে বাধা দেয়। নামায, কায়েম করে। যাকাত আদায় করে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কথা মেনেনেয়।"[১১]

আর মুমিন নর-নারীর বিপরীত মুনাফিক নর-নারীর বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ - (توبه ٦٧)

—"মুনাফিক নর ও নারী পরস্পর এক। তারা মন্দকাজে নির্দেশ দেয়। ভালো কাজে বাধা দেয়। সৎ পথে অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হয়। তারা আল্লাহকে ভুলে বসেছে। সন্দেহ নেই, মুনাফিকরাই সত্যিকারের ফাসিক।"[১২]

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুখোমুখি দু'টি চরিত্রের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এ বিপরীতমুখী দুটি চরিত্র হলো মুমিন নর–নারী ও মুনাফিক নর–নারীর। সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ এবং নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চলা মুমিন নর–নারীর বৈশিষ্ট্য। আর এসবের বিপরীত কর্ম সম্পাদন করা হলো মুনাফিক নর–নারীর চারিত্রিক পরিচয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইমাম হোসাইন ও তাঁর পরিবারবর্গ প্রথম শ্রেণীর মুমিন নর–নারীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম হোসাইন কখনো উমাইয়্যাদের অবিমৃশ্যকারীতার পক্ষে ছিলেন না। এমনকি তিনি তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণেরও বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোশহীন ব্যক্তিত্ব। আর তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল অন্যায়কারী জালিম, ফাসিক, অযোগ্য। যাদের ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতায় বসার অধিকার ছিল না।"[১৩] তাঁর প্রতি পক্ষ যে চরম জালিম ও অন্যায়ের আদেশকারী ছিল ইমাম হোসাইন হতে জোরপূর্বক বায়আত আদায় করে নেয়ার নির্দেশদান তারই প্রমাণ। আর তারা যে নামায কায়েম করতনা। নামাযের জন্য নির্দেশ জারী করত না তার প্রমাণ মদীনা শরীফ আক্রমণকারী এজিদ সেনাদের নামায না পড়া এবং নবীর মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করা। এরূপ ফাসিকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া নিতান্তই ধর্মীয় দায়িত্ব ছিল। এ দায়িত্ব হযরত ইমাম হোসাইন পালন করে গেছেন। ইমাম হোসাইনের প্রতি এজিদের আচরণ প্রমাণ করে যে সে কত বড় জালিমছিল। এসব জানা ছিল বলেই অন্য কেউ এজিদের বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম ময়দানে নেমে সক্রিয় ভাবে প্রতিবাদ জনানোর দুঃসাহস দেখাননি। এজিদের পূর্বে উমাইয়্যা শাসনের ২০ বছর হকের আওয়াজ কে জালিমী কায়দায় স্তব্ধ করে দেয়া হতো। আর জুলুমবাজী চালানোর জন্য অবৈধ জাতক যিয়াদ, তার ছেলে উবায়দুল্লাহ, ঘাতক মুসলিম ইবনু উক্‌বা মুররী, হোসাইন ইবনু নোমাইর প্রমুখকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থে প্রতি পালন করা হয়। আর তাদের জুলুম চালানোর খোলা সুযোগদেয়া হয়। এসব কারণেই আমীর মুআবিয়াকে হানাফী ফিকাহর প্রামাণ্য কিতাব –হিদায়াহ–প্রণেতা এবং আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী জালিম বাদশাহদের অন্তর্ভূক্ত

৮· মুসলিম শরীফ, বাবুল ইমারাহ ঃ

৯· খুতবাতুল আহকাম ঃ প্রণীত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাঃ)।

১০· মাইদাহ ঃ ৬৩ আয়াত।

১১· তাওবা ঃ ৭১ "

১২· তাওবা ঃ ৬৭ "

১৩· এমদাদুল ফাতাওয়া ঃ ৫৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১৪· হিদায়া ঃ ২য় খণ্ড বাব আদাবুল কাযী দ্রষ্টব্য। আইনী শরহে হিদায়া উক্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৫· তোহফা ইসনা আশারিয়া ঃ ২৮৮, ২৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৫/১ তোহফা ইসনা আশারিয়া ঃ ২৮৫ পৃষ্ঠা।

১৬· " " " ৫, ২৮৫ পৃষ্ঠা।

ইমাম হোসাইনের ব্যক্তিত্ব

والله مارأيت مكسورا قط قد قتل اهل بيته وولده واصحابه اربط جأشامنه -

আল্লাহর কসম এমন পর্যুদস্ত ব্যক্তি যার ছেলে সন্তান, পরিবার, সঙ্গীসাথী নিহত হয়েছে, কখনো দেখিনি যে ইমাম হোসাইনের ন্যায় সান্ত্বচিত্তের ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

(জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী।)

الطبرى

উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কতোইনা সুখের বিষয়! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোওয়া করেছেন, যে হাসান ও হোসাইনকে ভালবাসবে তাকে যেন আল্লাহ নিজেও ভালবাসেন। এরূপে হাসান ও হোসাইনের সাথে মহব্বত স্থাপন করলে নির্ঘাত আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়া যাবে। আর তাঁদের সাথে বেহেস্ত লাভ হবে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে যাকে ভালবাসবে সে তার সাথে থাকবে।।"[৭]

"পক্ষান্তরে যে সব বদ-নসীব এজিদকে ভালবাসবে তারা এজিদের সাথী হবে পরকালে। জান্নাতের সরদারদ্বয়ের কাছেও ঘেষতে পারবে না।

৬। হযরত ইবনু উমর বলেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

ان الحسن والحسين هما ريحانتاى من الدينا .

(ترمذى ج٢ ص٢١٧)

"নিশ্চয় হাসান এবং হোসাইন দু'জনই এ দুনিয়ায় আমার দু'টি খুশবুদার ফুল।"[৮]

৭। হযরত আনাস ইবনে মালিক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়, আহলে বাইতগণের মধ্যে আপনার অতি প্রিয় কে? উত্তরে নবী করীম (সাঃ) বলেন, হাসান ও হোসাইন। হযরত ফাতিমাকে নবী করীম বলে থাকতেন যে, আমার নাতি দু'টিকে ডেকে আন। তারা আসলে তিনি তাদের ঘ্রাণ নেতেন আর বুকে জড়িয়ে ধরতেন।[৯]

৯। সালামা তাঁর মাকে কাঁদতে দেখতে পান। আর কেন কাঁদছেন তা জানতে চান। হযরত উম্মে সালামা বলেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى فى السنام وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت مالك يارسول الله : قال شهدت قتل الحسين انفا - (ترمذى ج٢ ص٢١٨)

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি যে, তাঁর মস্তকেও দাড়িতে ধূলি মাটি লেগে রয়েছে। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি হল? তিনি বললেন, আমি এক্ষণেই হোসাইনের হত্যা স্বচক্ষে দেখে এসেছি।"[১০]

হাদীসটি লক্ষণীয়। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা পরিদর্শনে খোদ নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিয়েছিলেন। অসহায় অবস্থায় হোসাইনকে যারা শহীদ করেছে তারা কি রোজ হাশরে নবীজীর সামনে যেতে পারবে? তা মোটেই সম্ভব হবে না। কারণ অপরাধীদেরকে তিনি নিজেই সনাক্ত করে রেখেছেন।

ঘাতক উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পরিণাম ঃ

হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের কর্তৃত্বাধীনে কারবালার ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন। উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিল। হাত ছাড়া কূফা নগরীকে সে অতি চাতুর্যের সাথে পুনরায় হস্তগত করেছিল। আর মুসলিম ইবনু আকীলকেও সুকৌশলে হানি ইবনু উরওয়ার ঘরে আবিষ্কার করে ফেলেছিল। আল্লাহ প্রদত্ব বুদ্ধিমত্তাকে অন্যায় পথে লাগিয়েছিল উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ।

পরবর্তী সময়ে ঘটনা প্রবাহের শিকার হয়ে যায় উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ। সে মুসআব ইবনু যোবায়র এর হাতে যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ হারায়। মুসআব ইবনু যোবায়র উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের সেনাদলকে কতল করেন। আর তাদের মস্তকগুলো কুফার জামে মসজিদের আঙ্গিণায় স্তূপিকৃত করেন। লোকেরা এ দৃশ্য দেখার জন্য জমায়েত হয়। দর্শকদের মধ্যে আমারাহ ইবনু ওমায়েরও ছিলেন। তিনি বলেন,

لما جئ برأس عبيد الله بن زياد واصحابه نضدت فى المسجد فى الرحبة فانتهيت اليهم وهم يقولون قدجاءت قد جاءت فاذا حية قد جاءت تخلل الرؤس حتى دخلت فى منخرى عبيد الله بن زياد فمكثت هنيئة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قدجاءت قدجاءت - ففعلت ذلك مرتين او ثلاثا هذا حديث حسن صحيح - (ترمذى ج٢ ص٢١٨)

যখন উবাদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ও তার সেনাদের কাটা মস্তক আনা হল। আর মসজিদের আঙ্গিণায় স্তূপীকৃত করা হল। আমি তখন গেলাম। লোকেরা বলাবলি করছিল, এসে গেছে, এসে গেছে। দেখতে পেলাম একটি সাপ এসেছে। সাপটি স্তূপীকৃত খণ্ডিত মস্তকের ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করছিল। শেষাবধি উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নাকের দু'ছিদ্রের ভেতর ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ মস্তকের ভেতরে অবস্থান করল। তারপর বের হয়ে চলে গেল। একেবারে গায়েব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর

কারবালায় ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের লক্ষ্য ও তাৎপর্য ঃ

মহররম মাসের দশ তারিখকে 'আশুরাআ' বলা হয়। (আল-মুনজিদ) মহররমের উক্ত দিনে উল্লেখযোগ্য বহু ঘটনার উৎপত্তি। ৬১ হিজরী সালে মহররমের দশ তারিখে কারবালা প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের মর্মান্তিক শাহাদাত মুসলিম বিশ্বকে স্তমিত করেছে। আজো জনমনে তার ব্যথা অনুভূত হয়। লেখকের রচনায়, কবির কাব্যে, বক্তার বক্তৃতায়, শোকাহতের শোক গাথায় ভেসে বেড়ায় শহীদে কারবালার বিলাপ ও মাতম। মনে হয় ইমাম হোসাইন যেন এইমাত্র শাতাদাতবরণ করেছেন। আর তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশের স্রোতে ভেসে চলেছে মুসলিম জগত। আহাজারি ছড়িয়ে যাচ্ছে। আকাশে-বাতাসে মাঠে-ময়দানে, এমনকি ভিক্ষুকের কাতর ক্রন্দনে। রোনাজারির হৃদয় বিদারী শোকমাতমে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হযেছে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের আসল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য। এ যেন ইতিহাসের বিচ্যুতি বা বেসামাল পদস্খলন। এ পদস্খলন হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের তাৎপর্যকে ম্লান করে দিচ্ছে।

তাই রোনাজারি অব্যাহত রাখলেও ইমাম হোসাইনের শাহাদত বরণের লক্ষ্য আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। সে লক্ষ্য হাসিলেব পথে প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। এ জন্য শহীদে কারবালার ন্যায় প্রাণও কুরবান করে দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তখনই আমরা ইমাম হোসেনের প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতি দেখাতে পারব। আমরা তাঁর জীবন দানের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পেরেছি বা এ লক্ষ্য আদর্শের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করে যাচ্ছি, আমাদের এরূপ প্রাণান্ত প্রয়াস ইমাম হোসাইনের আত্মাকে স্বস্তি দান করবে। তখনই তাঁর প্রতি আমাদের শোক প্রকাশ সার্থক হবে।

ইমাম হোসাইন ছিলেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় নাতি। হাদীস শরীফে তাঁর প্রতি নবী স্নেহের প্রামাণ্য আচরণের উল্লেখ রযেছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধে সাওয়ার ছিলেন। সাহাবাগণ বললেন, হোসাইন তোমাব বাহনটি কতো চমৎকার! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে উঠলেন ঃ উপবেশনকারীকে লক্ষ্য কর, সেও যে উত্তম।[১] নবী মুস্তফা আলাইহিস সালাম স্নেহ ভরে বার বার হযরত হোসাইনের চন্দ্র মুখে চুমু খেতেন। আর নাতিদেরকে দেখার জন্য হযবত আলীব বাড়ীতে এসে উপস্থিত হতেন।[২] বহুবার ইমাম হোসাইনেব তৃষ্ণা নিবাবণেব জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মোবারক জিভ হযরত হোসাইনের মুখে তুলে দিযেছেন। আর ইমাম হোসাইন তা চুষে

তৃষ্ণা নিবৃত্তি করেছেন।[৩] মনে হয়, ফুরাত কূলের পিপাসা সেখানেই মিটিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। নবী মুখ সরোবরের সুধাময় পানি পানের পর কর্দমাক্ত ফুরাত নদীর নীর পানের প্রয়োজন থাকে না। তাই ইতিহাস হয়তো ইমাম হোসাইনকে পানি দানে ব্যর্থ হয় কারবালার ময়দানে। পিপাসায় ঠোঁট-বুক শুকিয়ে গেলেও পানি না পেলে ভ্রুক্ষেপ করতে নেই, এগিয়ে যেতে হবে সংগ্রামের পথে। ইমাম হোসাইন এ শিক্ষা দিয়ে গেলেন ফুরাতের পানি পান না করে। পানির অপর নাম জীবন। এ জীবনও যে তাঁরই যিনি তা দান করেছেন। তাই জীবনও সৃষ্টি কর্তার উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দিতে হবে, এটাই কারবালার শিক্ষা।

এক হাদীসে এসেছে,

- من تمسك بسنتى عند فساد امتى فله اجر مائة شهيد

"আমার উম্মতের বিপর্যয়ের সময় যে আমার পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে সে একশ' শহীদের ছাওয়াব লাভ করবে।"[৪] এ হাদীস মতে নবীর পদ্ধতির বিপরীত কর্মকে 'ফাসাদে উম্মত' -উম্মতের বিপর্যয় বলা হয়েছে। অর্থাৎ নবীর রীতি বিরোধী আচরণে তাঁর উম্মতের বিপর্যয় অনিবার্য। তখন নবীর নীতি আঁকড়ে থাকলে শত শহীদের পূর্ণার্জিত হয় এবং নবীর উম্মতের বিপর্যয় ঠেকানো যায়। তাই এতো নেকী। আর কেউ যদি উম্মতের এরূপ বিপর্যয় ঠেকাতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করে দেন তাহলে তাঁর নেকীর কোন পারাপার থাকবে না। এটাই সাধারণভাবে বোধগম্য হয়। ইমাম হোসাইন (আঃ) এরূপ প্রেক্ষাপটেই বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর চোখের সামনে নবীর (সাঃ) বিধান লংঘিত হচ্ছিল। রাষ্ট্রও সমাজ বিপথগামী হয়ে উঠেছিল। উমাইয়্যাদের দাপটে কেউ প্রতিবাদ করার স্পর্ধা দেখাতে পারত না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মুখ ফুটে প্রতিবাদ করাতো দূরের কথা, ধর্মীয় বিচ্যুতি ঘটালেও কেউ কথা বলতে পারত না। হযরত হুজুব ইবনু আদী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র হত্যাকাণ্ড এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইতিহাস নিন্দিত, গণধিকৃত, দুরাচার, অবৈধ সন্তান যিয়াদ দামেস্কের নরপরিত পক্ষ থেকে ইরাকের শাসন ভার লাভ করে। জনগণের মস্তকচ্ছেদের খেলা আরম্ভ করে দেয়। ইসলামী রীতি মোতাবেক শাসকবর্গ জুমআর নামাজে ইমাম হত। সে সুবাদে যিয়াদের ন্যায় দুরাচার ফাসিক জুমআর নামাজ পড়াতো। খুতবা পাঠে হযরত আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে গালমন্দ করত। খুতবায় কাউকে নিন্দাবাদ করা নেহায়েত নোংরামি। এ নোংরামি উমাইয়্যা শাসনে প্রচলিত ছিল। বশংবদ সরকারী কর্মকর্তারা

হোসাইনী সংগ্রামের উদ্দেশ্য

ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আব্দুর রাজ্জাক আল-মুসাবী বলেন ঃ

كان المغزى الوحيد لشهيد الدين وحامية الاسلام الحسين بن امير المؤمنين(ع) ابطال احدوثة الامويين ودحض المعرات عن قدس الشريعة ولفت الانظار الى برائتها وبرائة الصادع بها عما الصقوه بدينه من شبه العارو البدع المخزية والفجور الظاهر والسياسية القاسية - (مقتل الحسين مقدمه ص٧)

দ্বীনের শহীদ ইসলাম হেফাযতকারী, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী(আঃ)-এর ছেলে ইমাম হোসাইনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল উমাইয়্যা শাসনে সৃষ্ট বিদআতসমূহ উৎখাত করা। পবিত্র শরীঅতে প্রক্ষিপ্ত কলংক দূরিভূত করা, আর এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো যে শরীঅতের কোন সম্পর্ক নেই এবং যিনি শরীঅতের আহবান জানান তাঁর কোন সম্পর্ক নেই ওসব বিষয়ের সাথে যা লোকেরা তাঁর দ্বীনে আরোপ করেছে কলংক, লজ্জাকর বিদআত প্রকাশ্যে পাপাচার এবং জালেমী রাজনীতি।[১]

উমাইয়্যাদের জালিমী রাজনীতির মুখুস খুলে বিখ্যাত লেখক আহমদ আমীন তাঁর রচিত ইসলামের প্রভাত ضحىالاسلام (দোহাল ইসলাম) গ্রন্থে বলেন,

الحق ان الحكم الاموى لم يكن حكما اسلاميا يسوى فيه بين الناس ويكافى المحسن عربيا كان اومولى و يعاقب المجرم عربيا كان او مولى انما الحكم فيه عربى والحكام خدمة للعرب وكانت تسود العرب فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الاسلامية - (ضحى الاسلام ج١ ص ٢٧)

হক কথা হল বনু উমাইয়্যাদের শাসন ইসলামী শাসন ছিল না। যার মধ্যে সদাচারীকে প্রতিদান দেয়া হয় আরব অন্যরব নির্বিশেষে সবায়কে। আর অন্যায়কারীকে শাস্তি প্রদান করা হয় আরব অনারব নির্বিশেষে সবাইকে। বস্তুতঃ তাদের রাজত্বকালে শাসন প্রণালী ছিল আরবীয়। শাসকরা ছিল আরবদের সেবক। আরবরা তখন আরবী জাতিয়তার আকর্ষণে পরাভূত ছিল। ইসলামী চেতনায় বিমণ্ডিত ছিল না।[২]

উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইবনু হানাফিয়্যার নিকট ইমাম হোসাইনের লিখিত বাণী ঃ

মদীনা হতে বের হয়ে আসার পূর্বে ইমাম হোসাইন ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়্যাকে লিখিত পত্রে অসিয়ত করে বলেন,

بسم الله الرحمن الرحيم - هذا ما اوصى به الحسين بن على الى اخيه محمد الحنفية ان الحسين يشهد ان لااله الا الله وحده لا شريك له و ان محمداً عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وان الجنة حق والنارحق والساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من فى القبور -

وانى لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى صلى الله عليه وسلم و اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنكرواسير بسيرة جدى وابى على بن ابى طالب فمن قبلنى بقبول الحق فالله اولى بالحق ومن ردعلى هذا اصبر حتى يقضى الله بينى و بين القوم و هو خير الحاكمين -

وهذا وصيتى اليك ياخى و ماتوفيقى الابالله عليه توكلت و اليه انيب ثم توى الكتاب و ختمه و دفعه الى اخيه محمد - (المقتل للخوارزص ج١ ص١٨٨ فصل ٩)

(مقتل الحسين لعبد الرزاق الموسوى ص١٥٦)

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা হল অসিয়ত, যা ইমাম হোসাইন তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইবনু হানাফিয়্যার উদ্দেশ্যে করেছেন ঃ হোসাইন সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য

এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, তাদের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের বাধা দানের হুকুম ফরয হয়ে যায়। আর ইমাম হোসাইন এ ফরয কাজটি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সম্পাদন করেন। ফলে তাঁকে সপরিবারে শাহাদাত বরণ করতে হয়।

এখানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও ক'টি হাদীস সম্মুখে রাখা দরকার তাহলে হোসইনের জীবনদানের তাৎপর্য ভাল করে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من رائى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان -

"তোমাদের কেউ অন্যায় দেখতে পেলে বল প্রয়োগে তা পাল্টে দেবে। তা সম্ভব না হলে মুখে তার প্রতিবাদ করবে। তাও সম্ভব না হলে অন্তরে তার প্রতি ঘৃণাপোষণ করবে।" এটা হল দুর্বল ঈমানের কথা।"[৬]

এ হাদীস মতে ইমাম হোসাইনের সংগ্রাম যথার্থ ছিল। তিনি হযরত মুআবিয়ার যুগে আমীরে মুআবিয়ার কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। এযীদের জন্য অগ্রিম বায়আত প্রবর্তনের বিদআত জারি করার বিরোধীতা করেন। ইতিহাসে প্রমাণ মিলে যে, অন্যান্য সাহাবাগণও এদিবআতের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।[৭] আমীরে মুআবিয়ার মৃত্যুর পর এজিদ যখন পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতারোহনের অবৈধ উপায় প্রয়োগের জন্য তৎপরতা চালায় তখন তিনিও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহাবাগণ তার বিরোধীতা করেন। এখান থেকেই সংঘাত বেঁধে ওঠে।

বস্তুতঃ তখন যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে খেলাফতের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন একমাত্র ইমাম হোসাইন। এ জন্য সকলেই ইমাম হোসাইনের দিকে চেয়েছিলেন। আর বাস্তবে উমাইয়্যা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো একমাত্র ইমাম হোসাইনও নবী পরিবারের লোকজন ছাড়া অন্য কেউ কার্যকর ভূমিকা রাখার পর্যায়েও ছিলেন না। তাই এ কাজ সমাধা করার দায়িত্ব নবী পরিবারের উপরই বর্তায়। আর ইমাম হোসাইন পরিবার প্রধানরূপে তা পালন করতে অগ্রসর হন।

এ দায়িত্ব পালনের পরিনতিতে কারবালায় ইমাম হোসাইনের শাহাদত বরণের খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিব্রাঈল মারফতে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়েও দিয়েছিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)–এর হাদীস থেকে এ কথা জানা যায়। তিরমিযী শরীফে[৮] এবং 'আল–বিদায়া ওয়াল নিহায়াহ' গ্রন্থে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে।

সংগ্রামের কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় এজিদ বাহিনীর সামনে ইমাম হোসাইনের ভাষণ ঃ

নবীর দ্বীন পতিষ্ঠা এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যে ভাঙ্গন ধরছিল তা প্রতিরোধ করা ছিল ইমাম হোসেনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাঁর প্রদত্ত ভাষণে এরই প্রমাণ রয়েছে। ইমাম হোসাইন বায়জা নামক স্থানে সমবেত এজিদের সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণে বলেন ঃ

.... ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثالعهد الله مخالفا لسنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يعمل فى عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولاقول كان حقا على الله ان يدخله مدخله -

الا ان هؤلاء قدلزموا طاعة الشيطان و تركواطاعة الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستاثروا بالفئ واحلوا حرام الله وحرموا حلاله وانا احق من غير وقد اتتنى كتبكم وقدمت على رسلكم ببيعتكم انكم لاتسلمونى ولاتخزلونى فان تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم فانا الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسى مع نفسكم واهلى مع اهليكم فلكم فىْ اسوة -

وان لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتى من اعناقكم فلعمرى ماهى لكم بنكر لقد فعلتموها بابى و اخى

বাইতুলমাল ও গণিমতের মাল তসরুফ করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের খেলাফ কাজ করত। আল্লাহর হুকুমের পায়রাবী না করে শয়তানের হুকুম মেনে চলতো। এরূপ পথভ্রষ্ট রাষ্ট্র নায়কের বিরোধিতা করা কর্তব্য। কেউ দেখে শুনে এ কর্তব্য পালনে অবহেলা করলে আল্লাহ তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দান করেন। কাজেই আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পেতে হলে এরূপ শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে। তাই ইমাম হোসাইনের এ সংগ্রম। তিনি এ সব অন্যায় প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। আর তিনিই ছিলেন তৎকালীন পরিস্থিতিতে একমাত্র ব্যক্তি যাঁর ডাকে জনগণ আস্থা নিয়ে সাড়া দিতে পারত। এরূপে জুলুমের অবসান করা সম্ভব হত। কিন্তু বিশ্বাস ঘাতকরা অংকুরেই তা বানচাল করেদিল। আর চিরাচরিত পন্থায় একটি কল্যাণকর উত্থানের মাথায় আঘাত হানল।

মহৎ কাজে বাঁধা আসে

যতো মহৎ সংগ্রামই হোক না কেন সংগ্রামে ঝুঁকি থাকে। ঝুঁকি নেয়া না হলে মহৎ কাজ করা যায় না। বদর, ওহুদ, আহযার, হোনাইন সমর সবই ঝুঁকির ব্যাপার ছিল। ইসলামী বিধান রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামও ঝুঁকিপূর্ণ। জীবন পণ করে এ সব করা হয়। জালিম শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হক কথা বলাকে আফজালুল জিহাদ (উত্তম জিহাদ) বলা হয়েছে। কারণ মন্দ ক্ষমতাধররা ক্ষমতায় থেকে সমাজের বিকৃতি বাড়িয়ে তোলে। আর সংশোধনবাদী আন্দোলনকে বল প্রয়োগে থামিয়ে দেয়। এটাই ভ্রষ্ট শাসকদের রীতি। বস্তুতঃ ক্ষমতা দ্বারা যা করা যায় একক প্রয়াসে তা করা যায় না। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নেয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলা হয়ঃ

ان الله يزع بالسلطان مالايزع بالقرآن -

কুরআন দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা যা না করেন, রাষ্ট্র শক্তি দ্বারা তা পরিপাটি রূপে করেন। রাষ্ট্র শক্তি বিপথগামীদের হাতে এলে তারা সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। উপদ্রবে দেশ ছেয়ে যায়। আর এ শক্তি সৎ লোকের হাতে গেলে সমাজের বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। উমাইয়্যা যুগে ন্যায় পরায়ন শাসক হযরত উমর ইবনু আব্দুল আযীয এবং অন্যান্য জালিম শাসকরা এর দৃষ্টান্ত। তাই রাষ্ট্র শক্তি সর্বোত্তম মহৎ লোকের হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়। মক্কী জীবনের ১৩ বছরে যা সম্ভব হয়নি, মাদানী জীবনের ১০ বছরে তা সম্ভব হয়েছে। লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কারণ মক্কী জীবনে ইসলামের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। আর মাদানী জীবনে তা হস্তগত হয়েছিল। মক্কী জীবনে শুধু কুরআন প্রচার করা হত। আর মাদানী জীবনে

কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়নে রাষ্ট্র শক্তি সহায়ক ভূমিকা নেয়। কাজেই রাষ্ট্র শক্তিকে পংকিলতাবিমুক্ত রাখা নেহায়েত জরুরী। রাষ্ট্রীয় পংকিলতা ও অবিমৃশ্যকারীতা হল রাষ্ট্রীয় কোষাগারের যথেচ্ছ প্রয়োগ এবং তাকে গোষ্ঠীগত স্বার্থে ব্যবহার করা। যা সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও হয়ে থাকে। রাষ্ট্র ক্ষমতার সহায়তায় স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হয়, যা ন্যায় নীতির পরিপন্থি। এরূপ স্বৈরাচার আইন কানুনের অনুগত হয় না। জুলুম অত্যাচারে নেমে আসে। তখন শক্তিধর শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়–বড়ই কঠিন। তাই হাদীসে এসেছে ঃ

ان من اعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر -
(عينى شرح هدايه ج٣ ص ١٥١)

"জালিম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে হক কথা বলা বড় জিহাদ।"[২]

عن ابراهيم الصائغ عن عكرمة عن ابن عباس : قال النبى صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب و رجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله -
(احكام القرآن جصاص ج٦ ص٣٤)

"ইব্রাহীম সায়েগ ইকরমা, ইবনু আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হামযা ইবনু আব্দুল মুত্তালিব হলেন, শহীদকূলের সরদার। আর এমন ব্যক্তি যে জালিম বাদশাহের সামনে দাঁড়ায়। তাকে সৎ কাজের হুকুম দেয়, আর মন্দ আচরণ হতে বিরত রাখে, যার ফলে জালিম তাকে খুন করে ফেলে।"

এখানে 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার' তথা সৎ কাজের হুকুম ও অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার দায়িত্ব পালনকারী সাধারণ মানুষকে উহুদ সমরে শহীদ নবীজীর চাচা হযরত হামযা (রাঃ)–এর সম পর্যায়ে রেখে এ কাজের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বস্তুতঃ এরূপ দায়িত্ব পালন করা অতি কঠিন। তাই প্রতিদানও উত্তম। শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইন (রাঃ) এ দায়িত্ব পালনেই জীবন দান করেছেন। বনু উমাইয়্যা শাসন তখন পাকা–পোক্ত হয়ে জেঁকে বসেছিল। তারা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল।

অঞ্জাম দিতেই হয়। কারণ তা ফরয। আর মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার উপর জিহাদ ফরয থাকেনা। কাজেই হযরত ইবনে উমর ইবনে আব্বাস ইত্যাদি বয়োবৃদ্ধদের জন্য হয়তো এজিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ফরয নাও হতে পারে। কিন্তু তা আজীমত হলেও নবীর দ্বীনের মহব্বতে হয়তো তা করা বাঞ্ছনীয়ই ছিল। তা করা হলে মুসলিম উম্মার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আসনে হয়তো কোনো জালেম বসতে পারত না। শিথীল কর্মপন্থা গ্রহণের দরুণ ইসলামের ইতিহাসে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। এখনো হতে দেখা যাচ্ছে। আর সাধারণ অবস্থায় আমর বিল মারূফ ফরযে কিফায়া হয়ে থাকে। ইমাম হোসাইনের দ্বারা তা সমাধা হয়ে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে হয়তো কেউ নিষ্ক্রীয় থাকতে পারেন। কিন্তু "ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর" পংতি সর্বকালেই প্রযোজ্য।

ইবনে উমর ঃ

বৃদ্ধ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ইমাম হোসাইনের কুফা যাত্রার সংবাদ পেয়ে তিনদিনের পথ অতিক্রম করে ইমাম হোসাইনের সাথে দেখা করেন। তিনি কোথায় যাচ্ছেন জানতে চান। তিনি ইরাক যাচ্ছেন বলে জানান। ইবনে উমারকে তিনি ইরাকীদের বায়আত করার কথা অবগত করান। আর তাদের পাঠানো পত্রাদি দেখান। ইবনে উমর বলেন যে, তাদের এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করনা। তাদের নিকট যাবেনা। তারা বিশ্বাস যোগ্য নয়। হযরত ইবনে উমর বলেন যে, আমি তোমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস শোনাব ঃ

ان جبرئيل اتى النبى صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة وانك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لايليها احد منكم - فابى ان يرجع و اعنقه ابن عمر فبكى وادهش فى البكاء وقال استودعك من قتيل - بزارنے بهى عمده سندسے اسى قسم روايت كى هے -

(تحفه اثنا عشريه ص٥٣٦)

—"জিব্রাঈল নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলেন আর

দুনিয়া ও আখরাতের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে বললেন। তিনি আখিরাতকে বেছে নিলেন। আর তুমিতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহের অংশপিণ্ড। তোমাদের মাঝে এরূপ আর কেউ নেই। এরপরও ইমাম হোসাইন ফিরে যেতে রাযী হলেননা। ইবনে উমর তার গলা আলিঙ্গন করে কাঁদতে লাগলেন আর কাঁদতে কাঁদতে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। কাঁদাকাটির পর তিনি দোওয়া করে বললেনঃ ওহে নিহত হওয়ার নিকটে উপনীত আমি তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি।"[৪]

হযরত ইবনে উমরের বর্ণনাটি 'বায্যার' প্রণেতা বলিষ্ঠ সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনায় ইবনে উমর হযরত হোসাইনের পদক্ষেপকে বাগাওয়াতের পাপ বলেননি। যা থেকে বিরত থাকতে হবে। তিনি দেখছিলেন ফল হবে শাহাদাত বরণ। ইমাম হোসাইন অচিরেই নিহত হওয়ার নিকট উপনীত হবেন। আর দুনিয়া হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দেহের অংশ বিশেষ হারিয়ে যাবে। অন্যদিকে ইমাম হোসাইনের দৃষ্টি ছিল নবীর দ্বীনের প্রতি। নবীর তরীকাযে বিলুপ্ত হতে যাচ্ছিল। তাই নিজকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে তিনি নবী প্রদত্ত জীবন বিধান রক্ষা করার দিকে অগ্রসর হন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় তিনি বলেছেনঃ আমার চোখের সামনে নবীর (সঃ) দ্বীন বিনাশ হবে তা হতে পারে না। তাহলে আমি নানার নিকট কি জবাব দেব? তাই তিনি আল্লাহর রাহে জীবন দান করে দ্বীনকে রক্ষা করার পথ ধরেন।

হযরত ইবনে উমর আখিরাতে অনুপ্রাণিত হওয়ার নসীহত করেন। হযরত ইবনু উমরের চেয়ে হযরত ইমাম হোসাইন দ্বীন ও দুনিয়ার তফাৎ ভালরূপে অবগত ছিলেন। বাহ্যতঃ রাজত্ব লাভের প্রয়াস বলাগেলেও এটায়ে দ্বীন কাইমের প্রচেষ্টা ছিল তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ইমাম হোসাইন তাঁর ভাষণে ও পত্রাবলীতে একাধিকবার এর উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আব্বাস ঃ

হযরত ইবনে উমরের ন্যায় হযরত ইবনে আব্বাসও বাধাদেন। অন্ততঃ সংগ্রামের কৌশল বদলানোর পরামর্শ দেন। তিনি উপস্থিত হয়ে বলেনঃ ওহে আমার ভাতিজা! তোমার ইরাকে যাত্রার সংবাদে লোকেরা বিচলিত। আমাকে খুলে বল তুমি কি করতে যাচ্ছো? হোসাইন বলেনঃ আমি আজ-কালের মধ্যে রওয়ানা হচ্ছি-যদি আল্লাহর ইচ্ছা থাকে। ইব্নে আব্বাস বললেনঃ আমি একর্ম থেকে তোমাকে আল্লাহর

—"আল্লাহর কসম, আমি যদি কোন কীট পতঙ্গের গর্তেও ঢুকে পড়ি তবু তারা আমাকে বের করে আনবে। আর তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবে। আল্লাহর কসম তারা আমার ব্যাপারে অবশ্যই সীমা লংঘন করবে যেমনটি করেছে ইহুদীরা শনিবারের ব্যাপরে।"[৭]

এতো গেলো শুভানুধ্যায়ীদের প্রস্তাব ও অনুনয় বিনয়। শহীদে কারবালা দৃশ্যতঃ এসব সঠিক প্রস্তাব কেন গ্রহণ করেননি তার উত্তর উপরে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন টালবাহানা ও তদবীর-কৌশল এখানে খাটবে না। কারণ তারা এজিদের নির্দেশ মতো ইমামকে যেখানেই পাবে বের করে তাদের প্রয়োজন মিটাবে। অর্থাৎ বায়আত আদায় করবেই। ইয়ামনদেশের দূর্গ ও পাহাড় পর্বতের গুহা তাঁকে রক্ষা করতে পারবেনা। এমনকি মাটির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকলেও গর্ত থেকে তারা তাঁকে বের করে আনবে। কাজেই ইয়ামন গমন বা অন্যকোন উপায়ে আত্মরক্ষা করা যাবে না।

এছাড়া তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রে সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল সিরিয়া ও ইরাক। তারপর অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও এ দু'এলাকারই প্রধান্য ছিল। সিরিয়া ও সাওয়াদে ইরাকে প্রচুর ফসল ফলাত। এসব অঞ্চলের লোক সংখ্যাও অধিক ছিল। তারপর ছিল মিসরের স্থান। মিসর দূরবর্তী এলাকা তাই-তৃতীয় স্থানে অবস্থান করত। আর ইয়ামন পাহাড়ী এলাকা। লোক সংখ্যা কম, উৎপন্ন দ্রব্য স্বল্প ছিল। অন্যদিকে সিরিয়ায় ছিল বনু উমাইয়্যাদের রাজধানী। কাজেই বাধ্য হয়ে ইমাম হোসাইনকে ইরাকের পথ ধরতে হল। ইরাক সিরিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা রাখতো। মুসলিম ইবনু আকীলের হাতে ইরাকের বার হাজার যোদ্ধা ইমাম হোসাইনের জন্য বায়আত করেছিল। ইরাকের রাজধানী ছিল কূফায়। কূফা আসলে হযরত উমরের (রাঃ) আমলে সেনানিবাস হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং বনু উমাইয়্যার শাসনামলেও সেনা শহর রূপেই পরিচিত ছিল। ইরাকের বছরাও কূফা নগরীদ্বয় তেজারতী বাজার রূপেও প্রসিদ্ধ ছিল। এসব বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনেই আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (কার্রাঃ) মদীনা ছেড়ে কূফাকে রাজধানী করেছিলেন। কাজেই উমাইয়্যা স্বৈরাচার উৎখাত করতে হলে কূফা তথা ইরাকে গমন করাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

যদি ইয়ামনে গিয়ে হযরত ইবনু আব্বাসের কথা মতে দাওয়াতী কাজ শুরু করা হতো তাহলে এ সংবাদ দামেস্ক সরকার যথা সময়ে অবশ্যই পেয়ে যেত। এবং এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নিত। সিরিয়াও ইরাক দামেস্ক সরকারের করায়ত্বে থাকলে ইয়ামনে বসে কিছুই করা যেত না। ওখান থেকে পাহাড়ী মুষিক ইমাম হোসাইনকে দামেস্ক সরকার পাকড়াও করে নিয়ে যেত। কাজেই ইবনু আব্বাসের পরামর্শ ঠিক ছিল

না। ইমাম হোসাইন যদি যথা সময়ে একবার কূফায় এসে যেতে পারতেন, তাহলে তাঁকে আর ঠেকানো যেতো না। এ জন্যই এজিদের গুপ্তচরদের তথ্য অনুযায়ী নোমানইবনু বশীরকে সরিয়ে কূফায় অন্য শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। তা না করলে কূফা হাত ছাড়া হয়ে যেত। তাই এজিদ সভাসদগণের পরমর্শে তড়িৎ গতিতে উবায়াজুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদকে শাসনকর্তা বানিয়ে কূফায় পাঠিয়ে দেয়। ফলে কূফায় এজিদের শাসন টিকে যায় এবং তা আর তার হাত ছাড়া হয়নি। রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে বিখ্যাত তাফসীরকার ও ঐতিহাসিক তাবারির মাধ্যমে এজিদের গুপ্তচরদের পাঠানো পত্রটি পরিবেশন করলাম। নোমান ইবনু বশীরের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে উক্ত পত্রে লিখা হয় ঃ

وخرج عبد الله بن مسلم وكتب الى يزيد بن معاوية اما بعد فان مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة فبايعه الشيعة للحسين بن على فان كان لك بالكوفة حاجة فابعث اليها رجلا قويا ينفذ امرك ويعمل مثل عملك فى عدوك فان النعمان بن بشير رجل ضعيف او هو يتضعف -

(الطبرى ج٥ ص١٩٩ س.٢)

"গুপ্তচর আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুসলিম (রাজ প্রসাদ হতে) বের হয়ে এসে এজিদ ইবনু মুআবিয়াকে পত্র লিখে পাঠান ঃ "অতঃপর খবর-হলো মুসলিম ইবনু আকীল কূফায় এসে গেছেন। তার হাতে ইমাম হোসাইন ইবনু আলীর জন্য কূফায় আলীর অনুসারীরা বায়আত করে ফেলেছে। তোমার যদি কূফার প্রয়োজন মনে হয় তাহলে এখনি একজন শক্তিমান ব্যক্তিকে শাসনকর্তা করে প্রেরণ কর। যে তোমার নির্দেশ কার্যকর করবে। তোমার শত্রুর সাথে তুমি যা করতে অনুরূপ কাজ করবে। অবগত হও নোমান ইবনু বশীর দুর্বল ব্যক্তি বা তিনি দুর্বলতার ভান করছেন।" [৮]

উবায়দুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদের নিকট এজিদের পত্র ঃ

এজিদ গুপ্তচরের পত্র পেয়ে পরামর্শে বসল। এ বিপদে কাকে পাঠানো যায়, তা ছিল পরামর্শের বিষয়। জনৈক সভাসদ বলল, এ দয়িত্বে একমাত্র উবায়দুল্লাহ্ ইবনু

জিয়াদকে নিযুক্ত করা যায়। পরামর্শ মতে উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদকে ইরাকে পত্র লিখে কূফাতেও তাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হলো। আর নোমান ইবনু বশীর পদচ্যুত হলো। এজিদের পত্র নিম্নরূপ ঃ

اما بعد فانه كتب الى شيعتى من اهل الكوفة يخبرونى ان ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشق عصا المسلمين فسر حين تقرأ كتابى هذا حتى تأتى اهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه او تقتله او تنفيه والسلام - (الطبرى ج٥ ص.. ٢ س.٦)

"অতঃপর অবগত হও, কূফায় নিযুক্ত আমার লোকেরা আমাকে লিখেছে যে, ইবনু আকীল কূফায় পৌঁছে গেছে। সে লোকজনকে একত্রিত করে সেনা দল গঠন করছে। উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করা। তাই আমার এ পত্র পাঠ মাত্র যাত্রা কর। কূফাবাসীদের নিকট উপস্থিত হও। ইবনু আকীলকে তালাশ কর শামুক তালাশ করার ন্যায়। শেষে তাকে ফুটু কর। তাকে হয় বন্দী কর বা হত্যা কর বা কূফা হতে বহিষ্কার করে দাও। ইতি।" ৯

(তাবারী, ৫ম খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা)

এ পত্র পেয়ে ইবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ অত্যন্ত চতুরতার সাথে ইমাম হোসাইনের মতো পোষাক পরে মুসলিম ইবনু আকীলের চেকপোস্ট পার হয়ে সাথে মাত্র একজন গোলাম নিয়ে কূফায় প্রবেশ করে। সে সরাসরি শাসনকর্তার প্রাসাদে পৌঁছে যায়। চেকপোস্টের লোকেরা 'ইবনু রাসূলিল্লাহ' বলতেই চেক না করে উবায়দুল্লাহর বাহনটি ছেড়ে দেয়। এহেন গাফলতি মহা বিপর্যয় ডেকে আনে। মোট কথা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা প্রমাণ করা যে, কূফা তথা ইরাকের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এজিদ যদি ইরাক আয়ত্বে রাখতে না পারত তাহলে ইতিহাস ভিন্নরূপ ধারণ করত। তাই ইমাম হোসাইন সব কিছু বাদ দিয়ে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এটাই ছিল তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সময় মতে, পৌঁছতে না পারা অন্য কথা। তিনিতো সময় মত পৌঁছতে সচেষ্ট ছিলেন। কাজেই পশ্চিমা লেখকরা ইমাম হোসাইনের বুদ্ধিহীনতার কল্পকাহিনী রচনা করে ইমাম হোসাইনের সমর কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন।

হযরত ইবনু আব্বাস সন্তানাদি রেখে যাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। ইমাম এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করেননি। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সাথে থাকলেও যে, মুসলমানদের

মধ্যে নবী পরিবারের জানের নিরাপত্তা থাকবে না এ ধারনা ইমামের ছিল না। যে আলে রাসূলের প্রতি দিবারাত অন্ততঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে "আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা-আলি মুহাম্মদ" দোয়া পাঠ করে সমগ্র উম্মত নবী পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, তারা সেই মহান পরিবারের শিশু ও মহিলাদের প্রতি জুলুম করবে এ ধারনা ইমামের ছিল না। কথায় আছে, নিজের দ্বারা সকলেই অন্যকে ধারনা করে ঃ

(المرأ يقيس على نفسه)

ইমাম ছিলেন দয়ার সাগর। সকলকেই তিনি তেমনি মনে করতেন। আর সন্তানাদির প্রতি সকলেরই স্নেহ থাকে। কাজেই সন্তানাদিও মহিলাদের ব্যাপারে ইমাম নিরুদ্বেগ ছিলেন। কাজেই তিনি ভুল নীতি গ্রহণ করেননি। আজীবন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী পিতার সাহচর্যে রয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানের দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছেন। যুদ্ধ করেছেন। এমন ব্যক্তি কেমন করে সমর কৌশল গ্রহণ করার ব্যাপারে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন?[৯/১]

উমাইয়্যা শাসনামলের বিদআতসমূহ ঃ

আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি যে, উমাইয়্যা যুগে ইসলামী রীতি-নীতি বিরোধী বহু কাজ হয়েছে। না হক, খুন-খারাবী করা হয়েছে। বনু উমাইয়্যাদের শাসনকর্তাদের মধ্যে হযরত আমীর মুআবিয়ার (রাঃ) শাসন আমলেই বহু বিচ্যুতি দেখা দেয়। ঐতিহাসিক প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ এ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তবু ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের পটভূমি বর্ণনা করার নিমিত্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে হয়। তিনি ইসলামী বিধান মতে, 'খলীফা' ছিলেন কিনা এবং তাঁর সুদীর্ঘ ২০ বছর শাসনামলে তিনি নবীর তরীকার খেলাফ চলেছেন কিনা এসব প্রশ্ন ঐতিহাসিকগণ যথা স্থানে উল্লেখ করেছেন। আমরা বিতর্কে না গিয়ে এ যাবৎ তাঁর সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণ কি বলে গেছেন কেবল সংক্ষেপে সে কথাই উল্লেখ করবো।

হযরত আমীর মুআবিয়ার প্রবর্তিত বিদআতগুলোর উল্লেখ করে বলা হয় ঃ

وقال الشعبى : اول من خطب الناس قاعدا معاوية

(تاريخ الخلفاء للسيوطى ص١٨٧)

"ইমাম শা'বী বলেছেন ঃ প্রথম যে ব্যক্তি বসে লোকজনের সামনে খুতবা দেন তিনি হলেন, মুআবিয়া।"[১০]

وقال الزهرى : اول من احدث الخطبة قبل الصلواة فى العيد معاوية اخرجه عبد الرزاق فى مصنفه -
(تاريخ الخلفاء للسيوطى ص١٨٧)

"ইমাম যুহরী বলেছেন ঃ ঈদের নামাজের আগে যে ব্যক্তি বিদআতী তথা রসূলের (সাঃ) তরীকার বাইরে ভিন্ন পদ্ধতিতে খুতবা দানের প্রথা জারী করেছেন তিনি হলেন, মুআবিয়া।"[১২]

وقال سعيدبن المسيب : اول من احدث الاذان فى العيد معاوية - اخرجه ابن ابى شيبة وقال : اول من نقص التكبير معاوية - (تاريخ الخلفاء للسيوطى ص١٨٧)

"হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেছেন, ঈদের নামাজের জন্য সর্ব প্রথম আযান প্রবর্তন করেন মুআবিয়া। ইবনু আবী শায়বা এ কথা উল্লেখ করে বলেন, মুআবিয়া সর্ব প্রথম ঈদের নামাজের তাকবীর কমিয়ে দেন।"[১৩]

এতো গেল হযরত মুআবিয়ার (রাঃ) প্রবর্তিত বিদআতের সংক্ষিপ্ত ফিহরিস্তি। যেহেতু এসব কর্ম নবী করীমের আমলের বরখেলাফ ছিল, তাই চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমানরা তা গ্রহণ করেনি। উমাইয়্যা স্বৈরাচারের যুগেই এসব বিদআত জান্তার জোরে চালানো হত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اوكما قال
(مسلم)

"যা আমাদের রীতিতেই নেই তাকে সংযোজিত করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[১৪] হযরত আমীর মুআবিয়ার নবসংযোজনের ব্যাপারে তাই হয়েছে। উম্মাত তা গ্রহণকরেনি।

উমাইয়্যা শাসন আমল খেলাফতের অন্তর্ভূক্ত ছিল না বলে উল্লেখ করে বলা হয় ঃ

واخرج ابن ابى شيبة فى المصنف عن سعيد بن جمهان قال : قلت لسفينة ان بنى امية يزعمون ان الخلافة فيهم قال كذب بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك واول الملوك معاوية - (تاريخ الخلفاء ص١٨٧)

"ইবনু আবী শায়বা আল মুসাননাফে উল্লেখ করেছেন যে, সাঈদ ইবনু জুমহান বলেছেন, আমি হযরত সাফীনাকে (রাঃ) বলি, বনু উমাইয়্যারা ধারনা করে যে, খেলাফত তাদের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, বিড়াল চোখে মহিলাদের সন্তানেরা মিথ্যা বলেছে। বরং তারা হল নিকৃষ্টতম বাদশাহদের অন্তর্ভূক্ত। আর মুআবিয়া হল সর্ব প্রথম বাদশাহ।" ১৬

দেখা যায়, উমাইয়্যা শাসকগণ খলীফা নামে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেননি। এমনকি আমীর মুআবিয়াও এ নামের যোগ্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বাদশাহ বা রাজা। "ওয়া আউয়ুলুল মুলূকি মুআবিয়াতু" বাক্য তাঁর রাজা হওয়ার দিক নির্ণয় করে। এ প্রসঙ্গে শাহ আঃ আযীয (রাঃ) একমত পোষণ করে বলে ঃ

چنانچه اس حديث مين "الخلافة بعدى ثلثون سنة" ترمذى نے راوى حديث سعيدبن جمهان سے نقل كياهے كه جب ان سے كهاگيا كه مروابنون كو بهى تو خليفه كهتےهين تواس نے كها بنو الزرقاء يعنى بنو اميه نے جهوٹ بولا - وه تو بادشاه هين اور وه بهى شرير بادشاه -

(تحفه اثنى عشر يه : ٢٨٨)

যেমন এহাদীস "আমার পর তিরিশ বছর খেলাফত থাকবে" ইমাম তিরমিজী সাঈদ ইবনু জুমহান হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে যখন বলা হল, মরওয়ানীরাওতো

নিজেদেরকে 'খলীফা' মনে করে। উত্তরে তিনি বললেন, বনু যারকাআ তথা 'বনু উমাইয়্যারা' মিথ্যা বলে। তারাতো বাদশাহ আর তাও জঘণ্য ধরনের বাদশাহ। ১৬

(তোহফা-ই-ইসমা আশরিয়া ২৮৮৭)

معاویہ اور ان کے بعد آنے والے مروانی اور عباسی خودکو خلیفہ کہتے تھے اور دوسرے سے بھی کہلواتے تھے - یہ صرف اس مشابہت ظاھری کی وجہ سے .... (تحفہ ۱۸۳)

মুআবিয়া এবং তাঁর পর মারওয়ানী ও আব্বাসীরা নিজেদেরকে 'খলীফা' বলত। আর অন্যদের দ্বারাও বলাত। এ প্রয়োগ মাত্র ভাসাভাসা সম্পর্কের দরুন। ১৭

প্রকৃত 'খলীফা' ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদন করেন। রাজা-বাদশাহরাও আংশিকভাবে কিছু ধর্মের কাজ করে। সে সুবাদে তাদেরকেও 'খলীফা' বলা হয়ে থাকে, যা রূপক ব্যবহার মাত্র প্রকৃতপক্ষে তারা 'খলীফা' নামে আখ্যায়িত হতে পারে না। শাহ আঃ আযীয (রাঃ) এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মত বলে উল্লেখ করেছেন। আর মারওয়ানী আব্বাসী বনু উমাইয়্যা ইত্যাদিকে ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী 'খলীফা' বলা যায় না বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আমীর মুআবিয়া খলীফা ছিলেন না বাদশাহ ছিলেন

হযরত আমীর মুআবিয়া খলীফা ছিলেন না। কারণ খেলাফত মদীনা থেকে এবং সিরিয়া থেকে রাজতন্ত্র শুরু হবে বলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

عن ابی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الخلافة بالمدینة والملك بالشام -

(مشکوٰة المصابیح ۵۸۳ طبع دهلی)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ খেলাফাত মদীনায় রাজতন্ত্র সিরিয়ায়।[১৮]

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের চার খলীফার বায়আত মদীনাতে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আলীর (রাঃ) বায়আত মদীনাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনি কুফায় চলে যান। আর জনাব আমীর মুআবিয়ার বায়আত (অবৈধভাবে)সিরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। সিরিয়া থেকেই আমীর মুআবিয়ার খেলাফতের উৎপত্তি এবং সিরিয়াতেই শেষ। তিনি মদীনায় একবারও রাজধানী স্থাপন করেননি। মিশকাত শরীফে ৩নং টীকায় বলা হয়ঃ

..... قوله والملك بالشام اشارة الى ملك معاوية

١٢ مشكواة ح٣ ص٥٨٣ - مرقاة ولمعات -

-----নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্তি রাজতন্ত্র সিরিয়ায় এর মাধ্যমে মুআবিয়ার রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বরাতে মিরকাত ও লুমআত ভাষ্য মিরকাত।[১৯]

হযরত আমীর মুআবিয়া বাদশাহদ ছিলেন। তিনি খলীফা ছিলেন না।

এ কথা আলোচ্য হাদীস এবং হাদীসটির টীকা দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে সাব্যস্ত হল। কাজেই যারা তাঁকে খলীফা বা খলীফা রাশেদ বলেন তাঁদের বক্তব্য ভিত্তিহীন।

সূত্র সূচী ঃ

১· ইমাম আবু হানিফা কী সিয়াসী যিন্দেগী
২· আইনী ঃ হিদায়ার শারাহ– ৩য় খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।
৩· আহকামুল কুরআন ঃ জাসসাস– ৩য় খণ্ড, ৩৪ "
৪· তোহফা ইসনা আশারিয়া ঃ ৫৩ পৃষ্ঠা বরতে বাযযার ও তাবেরানী।
৫· তাবারী ঃ ৫ম খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা।
৬· ঐ ঐ ২১৭ ঐ
৭· ঐ ঐ ২১৭ ঐ
৮· ঐ ঐ ১৯৯ ঐ
৯· ঐ ঐ ২০০ ঐ
৯/১· শহীদের কারবালা ঃ মুফ্তী শফি ঃ ১০০ পৃষ্ঠ।
১০· তারীখুল খোলাফা ঃ ১৮৭ পৃষ্ঠা।
১১ ঐ ঐ ঃ ১৮৭ ঐ
১২· ঐ ঐ ঃ ১৮৭ ঐ
১৩· মুসলিম শরীফ ঃ
১৪· তারীখুল খোলাফা ঃ ১৮৭. পৃষ্ঠা।
১৫· তোহফা ইসনা আশারিয়া ঃ ২৮৮ পৃষ্ঠা।
১৬ ঐ ঐ ঐ ঃ ২৮৮ ঐ
১৭· ঐ ঐ ঐ ঃ ২৮৩ ঐ
১৮· মিশকাত ঃ ৫৮৩,
১৯· মিশকাত ঃ ৫৮৩ টীকা ঃ ৩,

ছাহেবে হেদায়ার দৃষ্টিতে হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ)

হাদীসে আমার উস্তাদ শায়খুল হাদীস মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আমাকে বলেছিলেন,

تحریر و تصنیف میں اکابر سے تفردنہ کرو -

অর্থাৎ ঃ "লিখতে গিয়ে এবং গ্রন্থ রচনায় বড়দের থেকে ভিন্ন পথ ধরবে না।" এ নির্দেশ মতে আমি আকাবিরের মধ্য হতে যে কোন মহান ব্যক্তির মতামতের সহযোগীতা লাভের আপ্রাণ চেষ্টা করি। এজিদ সম্পর্কে এবং আমীর মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করার পূর্বে উস্তাদের নির্দেশ মত আমি তাহকীক করার মেহনত করেছি। নিজের তরফ হতে কিছু বলিনি। এজিদের কথায় পরে আসছি। প্রথমে হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ) প্রসঙ্গে হানাফী ফিকাহে কি বলা হয়েছে তা আলোচনা করা যাক।

তাঁর সম্পর্কে আমরা শাহ আঃ আযীয (রাঃ)-এর মতামত পূর্বে ব্যক্ত করে এসেছি। তিনি বলেছেন, উমাইয়্যা, মারওয়াতী ও আব্বাসী শাসকরা কেউ তারা খলীফা ছিলেন না। রাজা-বাদশাহ ছিলেন। আর বাদশাহ তথা রাজতন্ত্রের পত্তন করেন মুসলমানদের মধ্যে সর্ব প্রথম জনাব আমীর মুআবিয়া (রাঃ)। তাই তিনি হলেন, "আউয়্যালুল মলূক।" সর্ব প্রথম মুসলিম বাদশাহ বা রাজা। শাহ আঃ আযীয (রাঃ) বলেছেন এসব মুসলিম রাজা বাদশাহরা "পরোক্ষ" অর্থে নিজেদের জন্য 'খলীফা' উপাধি ব্যবহার করেছেন মাত্র। কারণ খলীফা নামাজের জামাত, ঈদ ও জিহাদের দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকেন। মুসলিম রাজা বাদশহরাও অনুরূপ দায়িত্ব পালন করতেন। সে জন্য "মাজাযান" তথা পরোক্ষ অর্থে তাঁদেরকে 'খলীফা' বলা হয়।

(তোহফা-ই শানা আশারিয় ঃ ২৮৫, ২৮৩, ২৮৮ তারীফুল খোলাফা ঃ ১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আর হানাফী ফিকাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়ায় বলা হয় ঃ

ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل -

অর্থাৎ ঃ "অতঃপর জালিম বাদশাহর পক্ষ থেকে বিচারকের পদ গ্রহণ করা জায়েয, যেমন ন্যায় পরায়ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ পদ গ্রহণ করা জায়েয হয়।"

হিদায়ার মতনের উক্ত মূল পাঠ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিদায়া প্রণেতা আল্লামা বুরহানুদ্দিন (রাঃ) জনাব আমীর মুআবিয়াকে (রাঃ) জালিম বাদশাহর সারিতে ফেলেছেন। তিনি বলেন ঃ

لان الصحابة تقلدوا من معاوية والحق كان بيد على رضى الله عليه فى نوبته الخ .

(هداية ج ٣ ص ١٣٣ كتاب ادب القاضى)

"কারণ সাহাবাগণ মুআবিয়ার পক্ষ থেকে বিচারকের পদ গ্রহণ করেছেন। অথচ ন্যায় আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু'র হাতে ছিল তাঁর সময়কালে।" [১]

এখানে লক্ষণীয় যে, হিদায়ার মূল পাঠে (মতনে) 'জাইর' জালিম শব্দের বিপরীতে 'আদিল' ন্যায় পরায়ন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আর ব্যাখ্যায় আমীর মুআবিয়াকে (রাঃ) জালিম (জাইর) বাদশাহর সারিতে রাখা হয়েছে, যিনি আদিল (ন্যায় পরায়ন) ছিলেন না। হিদায়ার টীকা নং ১২ তে বলা হয় ঃ

. قوله لان الصحابة رضى الله عنهم الخ هذا تصريح بجور معاوية والمراد فى خروجه لافى اقضيته (=)

গ্রন্থকারের উক্তি, যেহেতু সাহাবাগণ আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাযী থাকুন, শেষ পর্যন্ত পাঠতব্য, স্পষ্ট আমীর মুআবিয়ার জুলুমবাজী (جور)কে নির্দেশ করে। এর অর্থ হল তিনি বিদ্রোহের মাধ্যমে জুলুমের পথ অবলম্বন করেছিলেন, বিচারের মাধ্যমে নয়।"[২] হিদায়ার ব্যাখ্যা ফাত্হুল্কাদীর গ্রন্থে বলা হয় ঃ

لان الصحابة رضى الله عنهم تقلدوا من معاوية رضى الله عنه والحق كان بيد على رضى الله عنه فى نوبته -

(فتح القدير ج٦ ص٣٦٤)

অর্থাৎ সাহাবাগণ আল্লাহ তাঁদের প্রতি রাযী থাকুন মুআবিয়া রাযিআল্লাহ আনহুর পক্ষে বিচারকের পদ গ্রহণ করেছেন। অথচ ন্যায় হযরত আলী রাযি আল্লাহ আনহুর পক্ষে ছিল–[৩] তাঁর সময়কালে।"

(فى ذلك النوبة) বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় ফাতাহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয় ঃ

..... انما كان الحق معه فى تلك النوبة لصحة بيعته وانعقادها فكان على الحق فى قتال اهل الجمل وقتال معاوية بصفين - ولقوله عليه الصلواة والسلام لعمار ستقتلك الفئة الباغية وقد قتله اصحاب معاوية يصرح بانهم بغاة -

(فتح القدير ج٦ ص٣٦٥)

"হক সে সময়ে আলীর সাথে ছিল। কারণ তাঁর বায়আত বিশুদ্ধ ছিল। আর তাঁর বায়আত গৃহীত হয়। তাই তিনি ন্যায়ের পথে ছিলেন জামাল[৪] ও সিফফীন যুদ্ধে[২০-১] মুআবিয়ার সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে। আর হযরত আলীর ন্যায়ের পথে থাকার প্রমাণ মিলে নবী আলাইহিস সালাত ওয়া সাল্লামের উক্তির আলোকেও তিনি আম্মারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ তোমাকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে। আর তাঁকে হত্যা করেছিল মুআবিয়ার সাথীরা। এ উক্তি প্রমাণ করে যে, মুআবিয়া ও তাঁর সাথীরা "বাগী" বিদ্রোহী ছিল।"[৬]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ) এবং তাঁর সাথীরা যাদের মধ্যে হযরত আমর ইবনু আসও রয়েছেন না হক পথে ছিলেন। তাঁদের হাতে হযরত আম্মার ইবনু ইয়াসির শাহাদাত বরণ করায় সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও তারা অন্যায় পথ থেকে বিরত থাকেননি। জেনে-শুনে অন্যায় পথ আঁকড়ে ধরে থাকেন। এটা তাঁদের ইজতিহাদী ভুল ছিল না। ইচ্ছাকৃত অনাচার ছিল। কাজেই ইজতিহাদী ভুলের খোঁড়া যুক্তিতে আমীর মুআবিয়া এবং তাঁর সাথীদেরকে ক্ষমার চোখে দেখার উপায় নেই। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে এজন্য তাঁদেরকে "বাগী" বলা হয়েছে। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থ প্রণেতা–

- يصرح بانهم بغاة এবং هذا تصريح بجور معاوية শব্দ প্রয়োগ

করে যাবতীয় বাতিল তাবিলের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ)–এর হাদীসটি আরও সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেন ঃ

عن عكرمة ان ابن عباس قال له ولعلى بن عبد الله آتيا اباسعيد فاسمعامن حديثه فاتيناه وهو واخوه فى حائط لهما يسقيانه فلما رانا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمربه النبى صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الله ويدعونه الى النار – (بخارى ج١ ص٣٩٤)

"ইকরামা বলেন ঃ ইবনু আব্বাস তাঁকে এবং আব্দুল্লাহর বেটা আলীকে বললেনঃ তোমরা আবু সাইদের কাছে চলে যাও। তাঁর হাদীস শোনো। তখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম। তিনি এবং তাঁর ভাই তাঁদের বাগানে পানি দিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে কাছে আসলেন। আর হাঁটুতে কাপড় জড়িয়ে বসে গেলেন। তারপর বললেন ঃ

আমরা মসজিদে নববীর জন্য ইট সংগ্রহ করছিলাম একটি একটি করে। আর আম্মার আনছিল দু'টি দু'টি করে। তখন তার নিকট দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচ্ছিলেন। তিনি আম্মারের মাথা থেকে ধূলাবালি মুছে দিলেন এবং বললেন ঃ হায়রে আম্মার! তোকে বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে। আম্মার তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকবে। আর তারা তাকে দোযখের আগুনের দিকে ডাকবে।"[৭]

এ হাদীস প্রমাণ করে আমীর মুআবিয়ার দল "আননার" তথা জাহান্নামের আগুনের দিকে আহবান করত। আননার এর "আল" দ্বারা সুনির্দিষ্ট আগুন বুঝায়। অর্থাৎ দোযখের আগুন। আর আম্মার আল্লাহর দিকে অর্থাৎ আল্লাহর অনুমোদিত হযরত আলীর পথের দিকে ডাকেন। এরূপ স্পষ্ট হাদীসের পরও কি এটাকে আমীর মুআবিয়ার (রাঃ) ইজতিহাদী ভুল বলে উপেক্ষা করা হবে? হযরত আম্মার এর উপর শয়তান কোনরূপ আছর করবে না বলে বুখারীর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। বুখারী

মনাকিবে আম্মার' অধ্যায় ১ম খণ্ড ৫৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। আর তিনি আগাগোড়াই হযরত আলীর পক্ষে ছিলেন। এটা হযরত আমীর মুআবিয়া ও আমর ইবনুল আস প্রমুখ অবগত ছিলেন। তারপরও ইজতেহাদী ভ্রমের খোঁড়া যুক্তি টেকে?

হযরত আয়েশা, যোবাইর, তালহা প্রমুখ নির্দোষ ছিলেন ঃ

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওজাহাহুর বিরুধিতা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা, হযরত যোবাইর, হযরত তালহা প্রমুখের কথাও এসে যায়। জংগে জামালে হযরত আলীর সাথে আলাপের পর তাঁদের ভুল ভেঙ্গে যায়। তারা রণে ভঙ্গ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীদের কারসাজিতে উষ্ট যুদ্ধ বেঁধে যায়। হযরত তালহা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। পাশ দিয়ে হযরত আলীর সমর্থন সৈনিক যাচ্ছিলেন। তিনি তার কাছে হযরত আলীর পক্ষে বায়আত নবায়ন করে মৃত্যুরকোলে ঢলে পড়েন। আর হযরত যোবাইর যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যান। মারওয়ান[৮] তাঁকে লক্ষ্য করে। আর তাকে হত্যা করার জন্য অনুচর ঘাতক প্রেরণ করে। রাতে যে বাড়ীতে হযরত যোবাইর আশ্রয় নিয়েছিলেন ঘাতকটিও সেখানে অবস্থান নেয়। আর রাতের অন্ধকারে তাঁকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। হযরত আয়েশাকে যুদ্ধ শেষে তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকরের হাতে তুলে দেয়া হয়। তিনি তাঁকে মদীনায় নিয়ে যান। আব্দুর রহমান হযরত আলীর সেনা দলে ছিলেন। হযরত আয়েশা তাঁর ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হন। এ প্রসঙ্গে ফাতহুলকাদীর প্রণেতা বলেন ঃ

ولقد اظهرت عائشة رضى الله عنها الندم كما اخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب قال : قالت رضى الله عنها لابن عمر ياابا عبد الرحمن ما منعك ان تنهانى عن مسيرى قال رأيت رجلا غلب عليك يعنى ابن الزبير فقالت اما والله لو نهيتنى ما خرجت (فتح القدير ج٦ ص٣٦٥)

অর্থাৎ ঃ "হযরত আয়েশা কৃতকর্মের দরুন লজ্জিত হন। ইস্তিআব গ্রন্থে ইবনু আব্দুল বার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইবনু উমরকে হযরত আয়েশা বলেছিলেন ঃ ওহে আবু আব্দুর রহমান! তোমার কি বাধা ছিল, তুমি আমাকে আমার যাত্রা পথে যেতে নিষেধ করনি? তিনি বললেন ঃ এক ব্যক্তি আপনার উপর চড়াও হয়েছিল। আমি তা দেখতে পাই। তিনি ইবনু যোবায়ের–এর কথা বলেছিলেন। তখন হযরত আয়েশা বলেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, তুমি যদি আমাকে বারণ করতে আমি বের হতাম না।"[৯]

এটাকেই বলা হয়, ইজতিহাদী ভুল বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভ্রান্তি। ভুল ধরা পড়ার পর হযরত আয়েশা (রাযি) অনুশোচনা করেছেন। এক বর্ণনায় এসেছে ঃ তিনি "ওয়াকারনা ফী বুয়ূতিকুন্না (তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে বসে থেকো)। আয়াত পাঠ করে কেঁদে উড়নার প্রান্ত দেশ ভিজিয়ে ফেলতেন।"[১০] আর বিদ্রোহ করার জন্য অনুসূচনা করতেন।

অন্যদিকে আমীর মুআবিয়াও তাঁর সাথীরা হযরত আম্মার ইবনু ইয়াসিরের তৎপরতা এবং তাদের হাতে নিহত হওয়ার পরও 'বাগাওয়াত' করতেই থাকেন। রণে ভঙ্গ দেননি। ইচ্ছাকৃতভাবে গোলযোগ সৃষ্টি করেন। হযরত উসমানের ভুয়া রক্তের দাবীতে এসব করে যান। অথচ তিনি নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও হযরত উসমানের রক্তের বদলে একটি মাছিও মারেননি। জনাব আমীর মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে এ হল বড়দের মত। এহেন ব্যক্তিকে 'খলীফা–ই রাশেদ' বলার অত্যোক্তি করা হয়।

সূত্র সূচী ঃ

১· হিদায়া ঃ ৩য় খণ্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, কিতাবু আদাবিলকাযী।
২· ঐ ঃ ঐ ১৩৩ ঐ টীকা নং ১২
৩· ফাতহুল কাদীর ঃ ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

৪· জামাল যুদ্ধ ঃ হযরত আলী কররামাল্লাহু অযহাহু ছিলেন খলীফা রব হক। হযরত উসমানের (রাঃ) রক্তের দাবীতে তাঁর বিরুদ্ধে উমাইয়্যা বংশের লোকেরা অভিযোগ তোলে। তিনি নব গঠিত খিলাফতের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বাদী পক্ষকে আইনানুগ পন্থায় খেলাফতের অনুগত হয়ে বিষয়টি বিচারালয়ে পেশ করতে বলেন। তারা এতে ব্যর্থ হয়। আর হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বিভ্রান্ত করে হযরত আলীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর সমর্থকদের নিয়ে বিদ্রোহ করেন। ফলে হযরত আলীর (কাররাঃ) সাথে যুদ্ধ বেঁধে যায়। যুদ্ধে হযরত আয়েশা পরাজিত হন। আর হযরত আলীর বশ্যতা স্বীকার করেন। যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার সময় হযরত আয়েশা (রঃ) উটের উপর সাওয়ার ছিলেন বলে ওই যুদ্ধের নাম হয়ে যায় জামাল যুদ্ধ বা উষ্ট সমর। উটকে আরবীতে 'জামাল' বলা হয়। উদ্ধৃতিটিকে 'জামাল যুদ্ধ' বলে এ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

৫· সিফ্‌ফীন সমর ঃ হযরত আলীর (কররাঃ) বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে জনাব আমীর মুআবিয়া বিদ্রোহ করেন। ফলে সিফ্‌ফীন নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বেঁধে যায়। যুদ্ধে আমীর মুআবিয়ার নিশ্চিত পরাজয় হতে যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় জনাব আমর ইবনুল আস পরামর্শ দিলেন যে, যে করেই হোক যুদ্ধ থামিয়ে দিতে হবে, তা না হলে পরাজয় অবধারিত। তখন তিনি আমীর মুআবিয়াকে কুরআন বর্শার আগায় তুলে যুদ্ধের ময়দানে বের হতে বলেন। আর তাঁরা বলতে থাকেন যে, তাঁরা এই কুরআনকে মধ্যস্থ করে ফয়সালায় আসতে চান। এ চাল ফলপ্রসূ হয়। হযরত আলীর পক্ষে দুর্বলতা প্রবেশ করে। তারা রণে ভঙ্গ দেয়। এ সমরকে সিফ্‌ফীন নামক স্থানের সাথে যুক্ত করে সিফ্‌ফীন সমর বলা হয়।

৬· ফাতহুল কাদীর ঃ ষষ্ঠ খন্ড, ৩৬৫

৭· বুখারী শরীফ ঃ ১ম খণ্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা।

৮· মারওয়ান ও হাকাম ঃ মারওয়ান ছিল হাকামের ছেলে। মারওয়ান আলে রাসূলের দুশমন ছিল। সে 'নাওয়াসেব গোষ্ঠীর' পুরোধা ঃ ছিল। (তোহফা ইশমা

আশাফিয়া ঃ ৯৭ পৃষ্ঠা)। যারা নবী বংশের চরম শত্রু ছিল তাদেরকে নাওয়াসিব (نواصب) বলা হয়। নরাধম মদীনার শাসনকর্তা অলীদকে বায়আত না করলে ইমাম হোসাইনকে হত্যা করার পরামর্শ দেয়। কথায় কথায় আলে রাসূলের অপমান করে। এ নরাধমের ষড়যন্ত্রে হযরত উসমান শাহাদাত বরণ করেন। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে হত্যা করে ফেলার জন্য মাওয়ার গোপনে হযরত উসমানের সীল লাগিয়ে মিসরে নিযুক্ত শাসনকর্তাকে পত্র পাঠায়। যা ধরা পড়ার পর বিদ্রোহীরা হযরত উসমানকে হত্যা করে।

আর হাকাম মুর্তাদ হয়ে যায়। পরে হযরত উসমানের সুপারিশে নবী (সাঃ) তাকে ক্ষমা করেন। আর মদীনা হতে বের করেদেন। কিন্তু নবী ধিকৃত এ ব্যক্তিকে পরে উমাইয়্যারা মদীনায় নিয়ে আসে। হযরত আবু বকর ও উমরের জামানায়ও হাকামের জন্য মদীনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

৯· ফাতহুল কাদীর ঃ ষষ্ঠ খণ্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা।
১০· ইকদুল জীদ ঃ

বছরাবাসীদের প্রতি ইমামের পয়গাম

آپ لوگ دیکھ رہے ہین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہن ہے اور بدعات پھیلائی جارہی ہین -

مین تمہین دعوت دیتا ہون کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذکے لیئے کوشش کرو - (کامل ابن اثیر ج٤ ص٩)

—আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়মনীতি (সুন্নত) মুছে ফেলা হচ্ছে। আর 'বিদআত' প্রসারিত করা হচ্ছে। আমি আপনাদেরকে ডাকছি, আপনারা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতের সংরক্ষণ করুন। আর তাঁর নির্দেশাবলী জারি করুন।

(শহীদে কারবালা হতে গৃহীত)

(পৃষ্ঠা ঃ ১০৮)

এজিদ প্রসঙ্গ

হযরত ইমাম হোসাইন আলোচনা এজিদ প্রসঙ্গ না টানলে অসমাপ্ত থেকে যায়। এজিদকে 'লাঈন' (لعين) বলেছেন মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাঃ) দিয়ারে হাবীব গ্রন্থে।[১] এবং আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী তারীখুল খোলাফা গ্রন্থে।[২] আর 'এজিদ-ই-পালীদ (يزيد پليد) বলেছেন শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী (রাঃ) তোহফা ইসনা আশারিয়া কিতাবে।[৩] কোন কোন আলেম চরম মন্তব্য করতে গিয়ে এজিদকে কাফের পর্যন্ত বলে ফেলেছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাঃ) তাকে 'ফাসেক' বলেছেন এমদাদুল ফাতাওয়া কিতাবে।[৪] এঁরা সকলেই সুন্নী আলেম। তাই সুন্নী মতে এজিদ নূন্যতম পর্যায়ে "ফাসিক-লাঈন-পালীদ আর চরম পর্যায়ে কাফের। সে মুত্তাকী পরহেজগার মোটেই ছিল না। উক্ত রূপ বিশেষণে এজিদের অবস্থান কোথায় তা অনায়াসে অনুমান করা যায়। এজিদ নবীর (সাঃ) সাহাবী ছিল না। তার পিতা হযরত মুআবিয়া অবশ্য সাহাবী ছিলেন। তিনিই 'খলীফা' পদবীতে ভূষিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন না বলে শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিন দেহলবী (রাঃ) মন্তব্য করেছেন। আমরা তাঁর উদ্বৃতি টেনে এ কথা পূর্বে বলে এসেছি। আর হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য কিতাব-হিদায়া-তে গ্রন্থকার আমীর মুআবিয়াকে জালিম বাদশার সারিতে উল্লেখকরেছে।[৫] এ হল ইসলামে 'খলীফা' পদবীর মর্যাদা। এ মহান মর্যাদা লাভের অধিকারী এজিদের ন্যায় দুরাচার ফাসেক অপবিত্র-পালীদ, মতান্তরে কাফির, কোনক্রমে হতে পারে না। সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে তাকে 'খলীফা বা আমীরুল মুমিনীন বলে আখ্যায়িত করেছে ইসলামের দণ্ডবিধি মোতাবেক এরূপ ব্যক্তিকে 'দুররা' মারা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণ এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা তা উদ্বৃত করলাম।

قال نوفل بن ابى الفرات : كنت عند عمربن عبد العزيز فذكر رجل يزيد فقال :.قال امير المؤمنين يزيد بن معاوية فقال : تقول : اميرالمؤمنين ؟ وامربه فضرب عشرين سوطا - (تاريخ الخلفاء ١٩٧)

"নাওফিল ইবনু আবীল ফুরাত বলেন ঃ আমি উমর ইবনু আবদুল আযীয (রাঃ)–এর নিকট ছিলাম, সেখানে এক ব্যক্তি এজিদ প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে ফেলে ঃ

(قال امير المؤمنين يزيد بن معاوية)

মুআবিয়ার পুত্র আমীরুল মুমিনীন এজিদ বলেছেন–। এ কথা শোনার সাথেই হযরত উমর ইবনু আবদুল আযীয (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ তুমি এজিদকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলছ? উমর ইবনু আবদুল আযীয (রাঃ) লোকটিকে 'দোররা' মারার নির্দেশ দিলেন। তখনই তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করা হয়।"[৬]

ইসলামে এজিদের স্থান কোথায়? যারা তাকে "আমীরুল মুমিনীন" বলার দুঃসাহস দেখাবে তাদের শাস্তি কি এখানে তা পরিস্কার। এ যুগে এসে এজিদ পন্থী যেসব লেখক এরূপ ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন তারা কি বিষয়টি ভেবে দেখবেন? এজিদের কৃতিত্ব কি? নবী পরিবার ধ্বংস করা, মদীনায় অবাধ লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণ, কাবা ঘরে অগ্নি–সংযোগ, অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল করে ইসলামের খেলাফত–আলা–মিন হাজিন নবুয়্যত'–এর বরখেলাফ কাজ কর্ম করা। এজিদ কর্তৃক পবিত্র মদীনার সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকে সেনাবাহিনী দ্বারা ধর্ষণ ও লাঞ্ছিত করার বিবরণ দিয়ে আল্লামা সুয়্যুতী (রাঃ) বলেন ঃ

وكانت وقعة الحرة على باب طيبة وما ادراك ما وقعة الحرة ؟ ذكره الحسن مرة فقال والله ماكاد ينجومنهم احد قتل فيها خلق من الصحابة رضى الله عنهم ومن غيرهم - ونهبت المدينة ولفتض فيها الف عذراء فانا لله وانا اليه راجعون - قال صلى الله عليه وسلم من اخاف اهل المدينة اخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين راواه مسلم - وكان سبب خلع اهل المدينة له ان يزيد اسرف فى المعاصى -

(تاريخ الخلفاء ١٩٥)

"মদীনার উপকণ্ঠ 'আল–হাররা'য় বিপর্যয় ঘটে। তুমি কি জান যে, আল–হাররা বিপর্যয়টি কি ছিল! একদা হাসান বছরী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে এ রূপ বর্ণনা করেন ঃ

আল্লাহর কসম করে বলছি এ ঘটনায় কারো পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। এ ঘটনায় বহু সংখ্যক সাহাবা (রাঃ) এবং সাহাবা ব্যতীত অন্যান্য বহু লোক প্রাণ হারান। মদীরায় অবাধে লুণ্ঠন চলতে থাকে। এ ঘটনায় এক হাজার অবিবাহিতা পর্দানশীল যুবতীর সতীত্ব বিনষ্ট করা হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে মদীনাবাসীদেরকে ভয় দেখাবে আল্লাহ তাকে ভয় দেখাবেন। তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেস্তা এবং সকল মানুষের লাআনত অভিসম্পাত।" হাদীসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ এজিদের বিরুদ্ধে মদীনাবাসীদের বিদ্রোহের কারণ ছিল এই যে এজিদ চরমভাবে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল।"[৭]

এ উদ্বৃতি ও মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না। এজিদ অসৎ চরিত্রের অধিকারী ছিল বলে তার অধীনস্থ সৈন্যরা চরম পাপাচারী হয়ে ওঠে। ফলে ইসলামের শালীনতাও শিষ্ঠাচার এবং সামাজিক মূল্যবোধ আহত ও বিপর্যস্ত হয়। 'আননাসু আলাদ্বীনি মুলূকিহীন'– "সাধারণ মানুষ শাসক গোষ্ঠীর অনুসারী হয়।" প্রবাদটি সঠিক প্রমাণিত হয়।

এজিদের না হক ফরমান জারি

হযরত আমীর মুআবিয়ার মৃত্যুর পর ৬০ হিজরী সালের রজব মাসে যুবরাজ এজিদ তার পিতার রাজাসনে বসে। রাজতখতে বসেই মদীনা শাসন করার জন্য পূর্ব থেকে তাদের নিযুক্ত কর্মচারী অলীদ ইবনু উতবার প্রতি নিম্নোক্ত ফরমান জারি করেঃ

اما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة اخذا شديدا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام – (الطبرى ج٥ ص١٨٨ س.٢٠)

–অতঃপর হোসাইন আব্দুল্লাহ ইবনু উমর, আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়রকে বায়আত করার জন্য শক্তভাবে ধর কোন রূপ অবকাশ দেবে না। তাদের নিকট হতে বায়আত আদায় করে ছাড়বে ইতি[৮]"

হযরত হোসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়র প্রমুখ ছিলেন মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। সে সময় এঁরাই ছিলেন নবী (সাঃ)–এর তরীকা ও ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধান সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানবান।

যুবরাজ প্রথায় গয়ের ইসলামী প্রণালীতে এজিদের জন্য আগাম বায়আত গ্রহণ বৈধ হয়ে থাকলে তারা এজিদের হাতে বায়আত করে তাকে আমীরুল মুমিনীন মেনে নিতেন। من شذ شذ فى النار "যে একাকী ভিন্ন পথ দরে সে ভিন্ন পথ ধরে জাহান্নামে যায়–এর পথ ধরে জাহান্নামগামী হতেন না। এতে প্রমাণিত হয় কারো জন্য অহেতুক আগাম বায়আত জোগাড় করার বৈধতা ইসলামে নেই। বিশেষতঃ ঔরসজাত সন্তানের জন্য এরূপ করার বৈধতা দেয়া হলে ইসলামের খেলাফতে নির্বিঘ্নে রাজতন্ত্রের অনুপ্রবেশ করার পথ খুলে যেত। তাই তাঁরা এরূপ অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটানোর পথ বন্ধ করার জন্য আমীর মুআবিয়া কর্তৃক আলী–আহাদ বা যুবরাজ ঘোষণার সাথে একমত হননি। তাঁরা আমীর মুআবিয়ার মুখের উপরই এ কথা বলেদেন। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, এজিদের জন্য অগ্রিম বায়আত সংগ্রহের স্বীকৃতি ইসলামে ছিল না বলেই তাঁরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এজিদ উক্ত গয়ের ইসলামী স্বৈরাচারী ব্যবস্থা মেনে নেয়ার জন্য জোর জবরদস্তীমূলকভাবে উল্লিখিত মহান ব্যক্তিদের থেকে তার জন্য বায়আত সংগ্রহ করার ফরমান জারি করে। এরূপ জবরদস্তী করার অধিকার এজিদের ছিল না। এ ফরমান লাভ করার পর এজিদের গোত্রীয় উপদেষ্টা মারওয়ান মদীনায় নিযুক্ত তখনকার কর্মচারী অলীদ ইবনু উতবাকে বলে ঃ হোসাইনকে ডেকে পাঠাও এবং বায়আত করতে বাধ্য কর। বায়আত না করলে কতল করে ফেল। তখন হযরত হোসাইনকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি বায়আত করতে সম্মত হলেন না। তিনি দরবার থেকে উঠে চলে যেতে উদ্বত হলেন। তখন মারওয়ান অলীদকে বলে ঃ

احبس الرجل ولايخرج من عندك حتى يبايع او تضرب عنقه – (الطبرى ص١٨٩ ج٥ س٢٠٥)

"লোকটিকে বন্দী কর। সে যেন তোমার নিকট থেকে বের হয়ে যেতে না পারে। তার থেকে বায়আত আদায় কর। বায়আত না করলে তাকে হত্যা কর।[৯]

স্বৈরাচারের কি সুন্দর পরামর্শ! মাথার ওপর মুক্ত তলোয়ার ঝুলিয়ে রেখে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার নাম রেখেছে 'মত গ্রহণ' বা বৈধ বায়আত? এ বেদআত জারি করেছিলেন খোদ আমীর মুআবিয়া (রাঃ)। তাঁর পরবর্তী শীষ্যরা তাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে। আল্লামা সুয়ূতী বলেন ঃ

..... وجعله ابوه ولى عهده واكره الناس على ذلك – (تاريخ الخلفاء ١٩١)

"..... আর তার বাপ (মুআবিয়া) তাকে (এজিদকে) যুবরাজ বানিয়ে নেয়। আর জনগণকে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেবার জন্য বল প্রয়োগ করে।[১০]

এজিদের চরেরা ইমাম হোসাইনের জন্য মদীনায় অবস্থান করা দুর্বিষহ করে দেয়। তাঁকে খোলাখুলি হত্যা করার হুমকি দেয়। মারওয়ানের ন্যায় এজিদ পন্থী দুরাচার ইমাম হোসাইনের সামনেই তাঁকে হত্যা করার জন্য আলীদইবনু উতবাকে পরমর্শ দিয়েছিল। অলীদ এতে রাযী হননি। দুনিয়ার জন্য তিনি দ্বীন ও আখেরাত বিনাশ করার বোকামী করতে অগ্রসর হননি। ইমাম হোসাইন এরূপ পরিস্থিতিতে মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। সেখানেও তাঁর পেছেনে গুপ্ত ঘাতক লাগিয়ে রাখা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়র তাঁকে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর উত্তরে বলেছিলেন এজিদের লোকেরা নিরাপদ বলে কোনো স্থান তার জন্য রাখেনি। তিনি বলেন ঃ

وايم الله لوكنت بحجرهامة من الهوام لاستخرجونى حتى يقضوا فىّ حاجتهم والله ليعتدون على لما اعتدت اليهود فى السبت - (الطبرى ح٥ ص٢١ س.٢٥)

"আল্লাহর কসম, আমি যদি কোন কীট পহঙ্গের গর্তেও লুকিয়ে থাকি তাহলেও তারা অবশ্যই আমাকে বের করে এনে আমার ব্যাপারে তাদের যা করা প্রয়োজন তা করবেই। আল্লাহর কসম, ইয়াহুদীরা যেমন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল আমার ব্যাপারেও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করবে।" [১১]

ইমাম হোসাইনের এ বর্ণনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এজিদের লোকেরা তাঁর জন্য এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যাতে তিনি নিরাপদে থাকতে না পারেন। ইমাম হোসাইন আরাফাত ময়দানে অবস্থান নেয়ার দিন মক্কা থেকে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। পথে হাজীদের কাফেলার সাথে দেখা হয়। এমন সময় হজ্জ সমাধা না করে তিনি শুধু উমরা হজ্জ করে চলে যাচ্ছেন কেন এ প্রশ্নের উত্তরেও ইমাম হোসাইন বলেছিলেন, তাঁকে গ্রেফতার করার ষড়যন্ত্র চলছে। হজ্জ সমাপ্ত হলেই তা কার্যকর করার ভয় রয়েছে। তাই তিনি চলে যাচ্ছেন। অর্থাৎ তিনি হজ্জের ন্যায় নেকীর কাজও নিরাপদে এজিদের আমলে সমাধা করতে পারছিলেন না। অবশ্য ইমাম হোসাইন ইতিপূর্বে বহুবার হজ্জ করেছিলেন। তাঁর উপর হজ্জ করা তখন ফরয ছিল না। এজিদী স্বৈরাচারের হাতে এরূপ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ইমাম হোসাইনের জন্য হিজাযে বাস করা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তিনি ইরাকের উদ্দেশ্যে হিজায ত্যাগ করেন।

এজিদের হাতে বায়আত করার জন্য যথাক্রমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়রকেও ডাকা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়র মক্কায় চলে যান। সেখানে তিনি হেরেম শরীফে আশ্রয় নেন। কারণ আমীর মুআবিয়া মরণকালে এজিদকে অসিয়ত করে যান যে, আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়রকে পেলে ক্ষমা করবে না। নির্মমভাবে তাকে হত্যা করে ফেলবে।[২] কি নিষ্ঠুর অসিয়ত? আর হযরত ইবনু উমর তাৎক্ষণিক বায়আত করতে অস্বীকার করেন। তবে সকল মুসলমানেরা এজিদকে বিনাবাক্যে মেনে নিলে তিনি বিদ্রোহ করবেন না বলে জানিয়েছেন। বস্তুতঃ এ শর্ত কেয়ামত পর্যন্ত পূরণ হওয়ার মতো ছিল না। এভাবে তিনি এজিদের হাতে বায়আত করা হতে নিষ্কৃতি পান।

এজিদী অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া

এজিদ ছলে-বলে, কুট-কৌশলে ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু জনগণ তার ক্ষমতা গ্রহণে অসন্তুষ্ট ছিল। অতঃপর গণঅসন্তোষ গণ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। এজিদ হযরত হোসাইনকে সপরিবারে কারবালায় শহীদ করেও পরিত্রাণ পায়নি। মদীনাবাসীরা প্রতিনিধি দল দামেস্কে পাঠিয়ে তদন্ত করিয়ে এজিদের পাপাচারের কথা জানতে পারেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু হাঞ্জালা গাসীলে মালাইকাহ (রঃ) প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন। এজিদ প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকনের নামে উৎকোচ দেয়ার পথ অবলম্বন করে। প্রতিনিধিরা তাদেরই বায়তুলমালের এ অর্থ এজিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ব্যয় করে। হযরত হাঞ্জালার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বলেন যে, এজিদের এতো পাপাচার তাদের চোখে পড়ে যে, এসব দেখেও যদি তাঁরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করতেন তাহলে আসমান থেকে হয়তো তাদের প্রতি পাথর বর্ষিত হতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালা বলেন ঃ

والله ماخوجت على يزيد حتى خفنا ان نرمى بالحجارة من السماء انه رجل ينكح امهات الاولادو البنات والاخوات ويشرب الخمر ويدع الصلواة - (تاريخ الخلفاء ١٩٥)

-আল্লাহর কসম করে বলি এজিদের বিরুদ্ধে একমাত্র তখনই আমি বিদ্রোহ করি যখন আকাশ হতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণের ভয় অনুভব করি। এজিদ যে

বাঁদীদের গর্বে মালিকের সন্তান জন্মায় তাদেরকে বিয়ে করে। উক্ত রূপ বোন ও মেয়েদেরকে বিয়ে করে। শরাব পান করে। নামায ছেড়ে দেয়-[১৩]।"

আমরা এখানে দেখতে পাই যে, এজিদের বিরুদ্ধে হালালকে হারাম করার এবং হারামকে হালাল মনে করার অভিযোগ ছিল। শরাব পানও নামায না পড়ার জঘণ্য ত্রুটি তাঁর ছিল বলে তাকে দোষারোপ করা হত। এরূপ অপরাধ যার থাকে তাকে মুসলমান মনে করা যায় না। আর মদীনার নারী নির্যাতনের জন্য সিরিয়া থেকে পাঠান সৈন্যদেরকে অনুমতি দিয়েছিল বলেও ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।[১৪] এসব কারণে হয়ত কেউ কেউ এজিদকে 'কাফির' বলে থাকেন। আর এরূপ ত্রুটির দরুন এজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে বলে উল্লেখ করে আল্লামা যাহবী বলেন ঃ

قال الذهبى : لما فعل يزيد باهل المدينة ما فعل مع شربه الخمر واتياته المنكرات اشتد عليه الناس وخرج عليه غير واحد - (تاريخ الخلفاء ص١٩٥)

"মদীনাবাসীদের সাথে এজিদ যে যথেচ্ছাচার করেছে, তা দেখে তদুপরি তার মদ পান ও পাপাচারে লিপ্ততা দেখার পর লোকেরা তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে এবং তার বিরুদ্ধে একাধিক ব্যক্তি বিদ্রোহ করে।" ১৬

আল্লামা যাহবী আরও উল্লেখ করেন যে, এজিদ মদীনা শরীফ ধ্বংস ও অপবিত্র করার পর মক্কায় অভিযান পরিচালনা করে। ইবনু যোবায়েরকে পদানত করার জন্য যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। পাথর নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে কাবা ঘরে আঘাত হানে। কাবা ঘরের গেলাফে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাবা ঘরের দেয়ালে ভাঙ্গন ধরায়। ছাদে ফাটল সৃষ্টি করে। ইসমাঈল (আঃ)-এর বদলে কুরবানীকৃত মেষের শিং এতে জ্বলে যায়।[১৬]

এসব হল এজিদের আমলের কৃতিত্ব। কোন কাফেরও কাবা ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়নি। এজিদ তা করেছে।

এজিদের কুম্ভীরাশ্রু

কারবালার যুদ্ধে ইমাম পরিবারের লোকদেরকে নিহত এবং খোদ ইমাম হোসাইনকে শহীদ করার পর নবী পরিবারের আর যারা বেঁচে ছিলেন তাদের প্রতি এজিদ সহানুভূতি দেখিয়েছে। সম্মানের সাথে তাদেরকে মদীনায় পৌছে দিয়েছে। লুণ্ঠিত মালের এবং মহিলাদের ছিনিয়ে নেয়া স্বর্ণালংকারের পরিবর্তে তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান

দিয়েছে ইত্যাদি কথা বলা হয়। এসব গল্পগুজব মাত্র। নবী পরিবারকে মদীনায় পৌছে দেয়ার পর সফরের সাথী এজিদের প্রেরিত ক্ষুদ্র সেনাদল প্রধানকে তাদের সহানুভূতির জন্য কি প্রতিদান দেয়া যায় এ নিয়ে হযরত যায়নাবের সাথে তাঁর ছোট বোন হযরত ফাতিমার কথা হয়। দেয়ার মত কিছুই ছিল না বলে তাঁরা দু'বোনে নিজেদের কানের স্বল্পমূল্যের বালি খুলে দেন। আর ক্ষমা চেয়ে রক্ষী প্রধানের নিকট এই মর্মে বার্তা পাঠিয়েছেন যে, তাঁদের আর কিছুই নেই। এ যা ছিল তা তাঁরা দিয়েছেন। এ নগণ্য প্রতিদান যেন গ্রহণ করা হয়। রক্ষীদল প্রধান বলেন ঃ তারা কিছু পাওয়ার আসায় উপকার করেনি। একমাত্র নবী পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করাই তাদের কাম্য ছিল। তাই তারা নবী পরিবারের দু'বোনের কানের বালি ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়।

ইতিহাসে এজিদের দানের ফিরিস্তি যেখানে দেয়া হয়েছে তারি পাশাপাশি নবী পরিবারে দৈন্যের এ চিত্র ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। কাজেই সত্য মিথ্যা পৃথক করার উপায়ও আমরা ইতিহাসেই খুঁজে পেতে পারি।

আর যে এজিদের বাহিনীর হাতে নবী পরিবারের ধ্বংস হলো, নির্লজ্জের মতো সে এজিদের উপহার জেওর গহনা সানন্দে দেহে ধারন করার মতো হীন মনোবৃত্তি নবী পরিবারের অবশিষ্ট পবিত্রা মহিলাদের ছিল বলে মেনে নেয়া নবী পরিবারের সচ্ছ মানসিকতায় কালিমালেপনের নামান্তর। পিতৃহন্তর দয়ার দান স্বর্ণ অলংকার কি ইমাম হোসাইনের মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিত না? এজিদ প্রদত্ত অলংকার পরে উল্লাস করার পরিবেশ কি তখন ছিল? এজিদের গহনা পরে লুণ্ঠিত নবী পরিবার আনন্দ উল্লাসে মদীনায় প্রবেশ করবেন এটা কি জ্ঞানে ধরে? এসব এজিদ পন্থী কলমবাজদের অযৌক্তি গালগল্প মাত্র।

বলা হয়, এজিদ হযরত ইমাম হোসাইনের নিহত হওয়াতে খুশী হয়নি। আমাদের প্রশ্ন হল। ইমাম হোসাইনের শির মোবাক এজিদের দরবারে তার সামনে রেখে দেয়ার পর স্বগর্বে এজিদ যে কবিতা পাঠ করেছিল তাওতো ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাকি প্রমাণ করে না যে, সে এ বিজয় লাভে কত আনন্দিত ছিল। তার মুখনিসৃত কবিতাংশ ইতিহাসে এসেছে। এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েও যে গণবিদ্রোহ ও জন অসন্তোষ নিবারণের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করা যায় বা বাস্তবে করাও হয় তাকি অস্বীকার করা যায়? ঐতিহাসিকের কর্তব্য হল জানা বা শোনা

কথা লিপিবদ্ধ করা। ইতিহাসের ঘটনাবলীর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা গবেষকদের কাজ। তাই ইতিহাসের যে কোন বর্ণনাকে চোখ বুঝে মেনে নেয়া যায় না। যেমন হযরত ইমাম হোসাইন রণে ভঙ্গ দিয়ে এজিদের হাতে বয়আত করার প্রস্তাব করেছিলেন বলে কোন কোন এতিহাসে দেখা যায়। তাযে বাস্তব নয় তা আমরা ইতিহাস আলোচনায় প্রমাণসহ উল্লেখ করব। এজিদের প্রাণে ইমাম হোসাইনের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও পাপাচারী এজিদ তার সামনে রাখা শহীদ ইমাম হোসাইনের মুখে ছড়ি ঠুকে দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ করতে পারতো না। এজিদ নামক পশুর এরূপ আপমানজনক আচরণ দেখে উপস্থিত সাহাবী হযরত আবু বারযা (রাঃ) সহ্য করতে পারেননি। জালিম এজিদের রোষানলের পরোয়া না করেই তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বলে উঠেনঃ

اتنكت بقضيبك فى ثغر حسين ؟

"তুই তোর হাতের ছড়িবেত দিয়ে হোসাইনের দাঁতের সারিতে আঘাত করছিস।"[১৭]

এখানেই ঈমানের পরিচয়। যিনি জান্নাতের সরদারদ্বয়ের অন্যতম তাঁর অবমাননা কোন ঈমানদার সহ্য করতে পারেন না। সাহাবী আবু বারযা (রাঃ)ও করেননি। বৃদ্ধ বয়সেরও তিনি এসব বেআদবী দেখে সহ্য করতে পারেননি। এজিদের দরবার থেকে চিরদিনের জন্য বের হয়ে আসেন।

ইতিহাসে দেখা যায় ইমানের তাগিদে এজিদ বাহিনীর কর্মকর্তা হুর ইবনু এজিদও এক পর্যায়ে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ইমাম হোসাইনের সাহায্যে পার্থিব পদমর্যাদা ও খ্যাতি গৌরব বিসর্জন দিযে হোসাইনী কাফেলায় এসে শরীক হয়েছেন। এ যুগেওযে এরূপ লোক কোথাও নেই তা কে বলতে পারে? আসুন আমরা জিহাদের ময়দানে হোসাইনী কাফেলায় শরীক হয়ে কালের এজিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাই। এজিদী সেনা পরিবেষ্টিত ইসলাম আজ মজলুম হোসাইনের ন্যায় কাতর নয়নে আমাদের সবার পানে তাকিয়ে আছে। আজ শুধু শোকাহত হওয়া কেন? আমাদরেকে হোসাইনের ন্যায় শরাহত হতে হবে। ইসলামের জন্য জান-মাল কুরআন করতে হবে ইমাম হোসাইনের মতো।

সূত্র সূচী ঃ

১· জাযবুল কুলূব ইলাদিয়ারিল হাবীব ঃ
২· তারীখূল খোলাফা ঃ
৩· তোহফা ইসনা আশারিয়া ঃ
৩/১· শরহে আকাইদে নাসাফী ঃ ১৬২ পৃষ্ঠা।
রুহুল মাআলী ঃ ৫ম খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা ও ৭৩ পৃষ্ঠা।
৪· ইমদাদুল ফাতাওয়া ঃ
৫· হিদায়া ঃ বাবু আদাবিল কাযী ঃ ৩য় খণ্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।
৬· তারীখুল খোলাফা ঃ ১৯৭ পৃষ্ঠা।
৭· ঐ ঐ ঃ ১৯৫ পৃষ্ঠা।
৮· তাবারী ঃ ৫ম খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা, ৬০ হিজরী।
৯· ঐ ঃ ঐ ১৯৮ ঐ ঐ
১০· তারীখুল খোলাফা ঃ ১৯১ পৃষ্ঠা।
১১· তাবারী ঃ ৫ম খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, ৬০ হিজরী।
১২· আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ঃ ৮ম খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।
১৩· তারীখুল খোলাফা ঃ ১৯৫ পৃষ্ঠা।
১৪· আওজাযুল মাসালিক ঃ ৩য় খণ্ড, ৪৮২ পৃষ্ঠা।
১৫· তারীখুর খোলাফা ঃ ১৯৫ পৃষ্ঠা।
১৬· ঐ ঐ ঃ ১৯৫ ঐ
১৭· তারাবী ঃ ৫ম খণ্ড, ২৬৮ পৃষ্ঠা, ৬১ হিজরী সাল।
আল-বিদায়া ওয়াননিহাযা ঃ ৭ম খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।

এজিদ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রঃ)

আল্লামা হায়সামী সাউয়াক (الصواعق) গ্রন্থে এবং আল্লামা বারজাঞ্জী ইশাআ الاشاعة গ্রন্থে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের অভিমত বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ এজিদের প্রতি লাআনাত করাকে বৈধ বলে কুরআন দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাফসীর রুহুল মাআনীতে বলা হয় ঃ

ان الامام احمد سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد قال كيف لايلعن من لعنه الله تعالى فى كتابه ؟ فقال عبد الله قدقرأت كتاب الله عزوجل فلم اجد فيه لعن يزيد فقال الامام ان الله تعالى يقول : فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِى الاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰه (محمد ٢٢) واى فساد وقطيعة اشد مما فعله يزيد ؟

(روح المعانى ج٢٥ ص٧٢)

ইমাম আহমাদের ছেলে আব্দুল্লা তাঁকে এজিদের প্রতি লাআনাত করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। তিনি ছেলেকে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যাকে তাঁর কিতাবে লাআনাত করেছেন তাকে লাআনাত করা হবে না কেন? আব্দুল্লাহ বললেন ঃ আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেছি। আল্লাহর কিতাবে এজিদের প্রতি লাআনাতের সন্ধান পাইনি। ইমাম আহমাদ তাকে বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ হতে পারে। তোমরা ফিরে যাবে আর পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের জঠর সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এরূপ লোকদের প্রতি আল্লাহ লাআনাত করেন।"[৪] কাজেই এজিদ যা করেছে তার চেয়ে অধিক উপদ্রব ও জঠর সম্পর্ক ছিন্ন করা আর কি হতে পারে?[৫]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল সূরা মুহাম্মাদের ২২ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, এজিদের প্রতি লাআনাত করা যায়। এজিদ পৃথিবীতে উপদ্রব করেছে। কাতয়ে রাহমী করেছে। আত্মীয়তার মর্যাদা রাখেনি। নবী পরিবারের চেয়ে আপন জন আর কে হবে? তাঁদের সাথে সে চরম দুর্ব্যবহার করেছে। রেহেম তথা জঠর সম্পর্ক অপেক্ষা নবী পরিবারের সম্পর্ক অতি আপন। যা এজিদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কাজেই

তার প্রতি লাআনাত করা যায়।

এজিদ কাফির ও মালউন ছিল বলে উলামাদের মন্তব্য

আল্লামা আলুসী তাফসীর রূহুল মাআনীতে এজিদ কাফির ছিল বলে এক জামাত উলামাদের অভিমত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وقد صرح بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزى وسبقه القاضى ابو يعلى وقال العلامة التفتازانى لانتوقف في شانه بل فى ايمانه لعنة الله تعالى عليه وعلى انصاره واعوانه وممن صرح بلعنه الجلال السيوطى عليه الرحمة - (روح المعانى ج٢٥ ص٧٢)

-"এজিদের কাফির হওয়া সম্পর্কে এবং তার প্রতি লাআনাত করার বৈধতার বিষয়ে এক জামাত উলামা পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন। তারা হলেন নবীর সুন্নাতের মদদগার ইবনুল জাউযী আর তাঁর পূর্বে কাযী আবু ইয়ালা। আর আল্লামা তাফতাযানী বলেছেন ঃ আমরা এজিদের ব্যাপারে দ্বিধা করব না। এমনকি তার ঈমানের ব্যাপারেও না। তার প্রতি, তার সাহায্যকারীদের প্রতি এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আল্লাহর লাআনত। যাঁরা স্পষ্ট ভাষায় এজিদকে লাআনাত করেছেন তাঁদের মধ্যে জালালুদ্দিন সুয়ূতীওরয়েছেন।"[৬]

সুনির্দিষ্টভাবে এজিদের প্রতি লাআনাত করা বৈধ হওয়ার প্রশ্নে আল্লামা আলুসী মত প্রদান করে বলেন ঃ

على هذا القول (اى على جواز القول بلعن معين) لانوقف فى لعن يزيد بكثرة اوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر فى جميع ايام تكليفه ويكفى ما فعله ايام استلائه باهل المدينة

ومكة فقد روى الطبرانى بسند حسن : اللهم من ظلم اهل المدينة واخافهم فاخفه عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لايقبل منه صرف ولاعدل -

والطامة الكبرى مافعله باهل البيت ورضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلواة والسلام واستبشاره بذالك واهانته اهل بيته مما تواتر معناه وان كانت تفاصيله احدا -

(روح المعانى ج٢٥ ص٧٢)

এ কথার ভিত্তিতে (অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে অভিসম্পাত দানের বৈধতার ভিত্তিতে) এজিদকে 'লাআনাত' করার প্রশ্নে আমরা দ্বিধা করব না। তার বহুবিধ নিকৃষ্টমানের দোষ করেছে। তার জবর দখলের দিনগুলোতে সে মদীনা ও মক্কাবাসীদের সাথে যে আচরণ করেছে তার ব্যাপারে বিচার করতে গেলে তাই যথেষ্ট। প্রসঙ্গতঃ ইমাম তিবরাণী 'হাসান সূত্রে' হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ খোদা হে! যে মদীনাবাসীকে জুলুম করবে, তাদের সন্ত্রস্ত করবে, তুমি তাকে ভীতির সম্মুখীন কর। এরূপ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ, ফিরিস্তাকূল, মানবকূলসহ সকলের অভিশাপ –(লাআনাত) হোক। এরূপ ব্যক্তির দান খায়রাত ও ইবাদত কবুল করা হবে না।

আর মহাপ্রলয়ের ন্যায় এজিদ নবীর আহলে বাইত– (পরিবারবর্গ)–এর সাথে যা করেছে আর ইমাম হোসাইনের হত্যাকে যেভাবে সানন্দে সে গ্রহণ করেছে হোসাইনের নানাও তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম নিবেদন করি এবং হোসাইনের পরিবারবর্গের সাথে সে যে সব অবমাননাকর ব্যবহার করেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ সূত্রগত একক বর্ণনা[১৩] এলেও অর্থ ও তথ্য দৃষ্টে (মুতাওয়াতির) ব্যাপক সূত্রে বর্ণিত।"[৭]

এখানে আল্লামা আলুসী এজিদের আপত্তিকর কার্যকলাপকে ব্যাপক সূত্রে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। যার উপর নির্ভর করে এজিদের প্রতি 'লাআনাত' করা যায়।

এজিদ এমন কর্ম করেছে যার দরুন সে নবী করীম (সাঃ)–এর দ্বারা অভিশপ্ত 'মালউন' সাব্যস্ত হয়। সে মদীনাবাসী ও মক্কাবাসীদেরকে নির্যাতন করেছে। কাবা ঘর আক্রমণ করেছে। মদীনায় নারী নির্যাতন করিয়েছে। তিনদিন যাবত অবাধে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার লিখিত ফরমান জারী করেছে। মদীনাবাসীদেরকে কাতল হত্যা করিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করে এসেছি। বিস্তারিত জানার জন্য শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবীর রচিত জাযবুল কুলুব গ্রন্থটি (৩৬ পৃষ্ঠা) পাঠ করা যায়। আর আমাদের রচিত–ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে হজ্জ ও কাবা দেখা যায়।

মহানবীর (সাঃ) বংশের অবমাননাকারী অভিশপ্ত

এজিদ নবী বংশের অবমাননা করেছে। তাঁদের নির্দয়ভাবে উৎপীড়ন করেছে। হত্যা করেছে। যে বা যারা নবী বংশের প্রতি এরূপ অবমাননাকর আচরণ করবে তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর দোওয়া কবুল নবীদের পক্ষ হতে 'লাআনাত' করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী তার তাফসীর গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

وفى الحديث ستة لعنهم الله وكل نبى مجاب الدعوة : المحرف لكتاب الله المكذب لقدر الله المتسلط بالجروت ليعز من اذل الله ويذل من اعز الله والمستحل من عترتى والتارك لسنتى - (روح المعانى ج٢٥ ص٧٢)

"হাদীসে ছয় ব্যক্তির বর্ণনা এসেছে যাদের প্রতি আল্লাহ এবং সকল দোওয়া কবুল নবী 'লাআনাত' করেছেন। (এক) আল্লাহর কিতাব পরিবর্তনকারীর প্রতি (দুই) আল্লাহর তাকদীরে অবিশ্বাসীর প্রতি (তিন) বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখলকারীর প্রতি যে আল্লাহ যাকে অপদস্থ করেছেন, তাকে সম্মানদান করে। আর আল্লাহ যাকে সম্মান দিয়েছেন তাকে অপদস্থ করে। (চার) আমার বংশধরদের অবমাননাকারীর প্রতি। (পাঁচ) আমার সুন্নাত তরককারীর প্রতি।"[৮]

এ হাদীস দৃষ্টে এজিদের প্রতি আল্লাহ এবং তাঁর সকল দোওয়া কবুল নবীদের তরফ হতে লাআনাত। কারণ সে নবী বংশের অবমাননা করেছে। আর সে বল প্রয়োগে

ক্ষমতা দখল করেছে অগ্রিম বাইয়াত গ্রহণের বিদআতী পদ্ধতি অবলম্বন করে। তার যামানায় মদীনা লুণ্ঠনকারী হোসাইন বিন নোমাইর, ঘাতক উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ, শিমার ইবনে জুল জউশান, উমর ইবনু সা'আদের ন্যায় জালিমরা সম্মান পায়। আর সাহাবী কিরাম ও নবী পরিবার লাঞ্ছিত হন। কাজেই তার যামানায় আল্লাহ যাঁদেরকে সম্মানিত করেছেন তাঁরা লাঞ্ছিত ছিলেন। আর লাঞ্ছিতরা সম্মানিত ছিল। এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর দোওয়া কবুল নবীগণ লাআনাত করেছেন। আর এজিদ যে সুন্নতের পাবন্দ ছিল না। সারাব পান, নাচ-গান, বাঁদর খেলা, কবুতরবাজী ইত্যাদি কুকর্মে লিপ্ত ছিল তা ইতিহাসের অকাট্য বিষয়। কাজেই সুন্নাত তরককারী রূপেও এজিদ লাআনাতের উপযুক্ত পাত্র।

এজিদের প্রতি লাআনাত প্রেরণের সর্বসম্মত উপায় ঃ

যারা সরাসরি এজিদের নামে লাআনাত করতে চায় না, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লামা আলুসী বলেন ঃ

ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذالك الضليل فليقل : لعن الله عز وجل من رضى بقتل الحسين ومن آذى عترة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بغير حق ومن غضبهم حقهم فانه يكون لاعناله لدخوله تحت العموم دخولا اوليا فى نفس الامر ولايخالف احد فى جواز اللعن بهذه الالفاظ ونحوها - (روح المعانى ج٢٥، ص٧٤)

-"যারা এ চরম ভ্রষ্টের প্রতি নাম করে লাআনাত করার ব্যাপারে নানারূপ প্রশ্নের দরুন ভয় পায় তারা যেন বলে ঃ আল্লাহ জাল্লাশানুহু লাআনাত প্রেরণ করুন তার প্রতি যে ইমাম হোসাইনের হত্যাকাণ্ডে আনন্দ পেয়েছে যে অন্যায়ভাবে নবীর বংশধরগণকে কষ্ট দিয়েছে। যে নবী বংশের হক জবরদখল করেছে। এরূপ অভিসম্পাত দেয়া হলে

এজিদকেই লাআনাত করা হবে। কারণ বাস্তবে সে সর্ব প্রথম ব্যক্তি রূপে এ ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। আর এরূপ বা অনুরূপ শব্দ প্রয়োগে এজিদের প্রতি লাআনাত করার বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনা।"[৯]

আর যারা চরম এজিদ পন্থী। এজিদের প্রতি যারা কোনরূপ দোষারোপ করতে চায়না তাদের প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসী বলেন ঃ

ذلك لعمرى هو الضلال البعيد الذى يكاد يزيد على ضلال يزيد - (روح المعانى ج٢٥ ص٧٤)

--"আমি কসম করে বলিঃ এটাহল চরম ভ্রষ্টতা। যা এজিদের ভ্রষ্টতাকেও অতিক্রম করে যায়।"[১০]

সূত্র সূচী ঃ

১· তাফসীর রূহুলমাআনী ঃ ২৫ খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা
২· ঐ ঐ ঃ ২৫ ঐ ঐ
৩· ঐ ঐ ঃ ২৫ ঐ ঐ
৪· সুর মুহাম্মাদ ঃ ২২ আয়াত।
৫· রূহুল মাআনী ঃ ২৫ খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা।
৬· ঐ ঃ ২৫ খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা।
৭· ঐ ঃ ২৫ খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা।
৮· ঐ ঃ ২৫ খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা।
৯· ঐ ঃ ২৫ খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।
১০· ঐ ঃ ২৫ খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।

কর্তিত শিরের মর্মান্তিক মিসিল

ইবনে যিয়াদ, এজিদের নির্দেশে নবীর পরিবারের বন্দীদেরকে এবং কারবালায় নিহত শহীদানের কর্তিত মস্তক--মিসিল দামেস্কে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিমার জুল জাউশান ইবনে সাআলাবা, শীস ইবনেরাবী আমর ইবনে হাজ্জাজ এবং আর লোককে নিযুক্ত করে।[১] তাদেরকে হুকুমদেয় তারা যে শহরে পৌঁছবে সেখানেই যেন কর্তিত মস্তকের প্রদর্শনী করা হয়। এরূপে মিসিলটি দামেস্ক নগরের দ্বার দেশে পৌঁছে যায়। ১লা সফর দামেস্কে পৌঁছায়। এজিদ তখন 'জায়রূন রাজ প্রসাদে' অবস্থান করছিল। সে প্রাসাদের বেলকুনীতে বসে এদৃশ্য উপভোগ করছিল। সে দেখতে পেল বন্দীরা আসছে। কর্তিত শিরগুলো বর্শার আগায় বিদ্ধ রয়েছে। জায়রূপ উপকণ্ঠে মিসিল পৌঁছলেপর বিলাপ প্রকাশ করতে থাকে। ওখানকার কাকাগুলো কলরব করে এজিদ তখন কবিতা আবৃত্তি করে বিজয় উল্লাস করে ঃ

لما بدت تلك الحمول واشرقت

تلك الرؤوس على شفا جيرون

نعب الغراب فقلت قل اولاتقل

فقد اقتضيت من الرسُول ديونى -

-"যখন ওসব বাহন চোখে পড়ল
আর ওসব মস্তক সামনে ভেসে উঠল জায়রূন উপকণ্ঠে
তখন কাককুল কলরব করে উঠল।
আমি বললামঃ কলরব কর বা নাই কর
আমি রাসুলের নিকট হতে আমার ঋণগুলো শোধ করে নিয়েছি

এজিদ তার বিজয় গাথায় যে ঋণের উল্লেখ করেছে
সে বিষয়ে তাফসীরকার আল্লামা আলূসী (রঃ) রূহুল মাআনী তাফসীর গ্রন্থে

বলেন ঃ

قال الالوسى : اراد بقوله "فقد افتضيت من الرسول دينى" انه قتل بما قتله رسول الله (ص) يوم بدر كجده عتبة وخاله ولدعتبة وغيرهما وهذا كفر صريح فاذا صح عنه فقد كفر به ومثله تمثله بقول ابن الزبعرى قبل اسلامه (ليت اشياخى) الابيات - (روح المعانى ج٢٥ ص٧٣ آية فهل عسيتم ان توليتم)

এজিদ তার উক্তঃ আমি রাসূলের (সঃ) নিকট হতে আমার ঋণগুলো শোধ করে নিয়েছি– দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছে যে রাসূল আলাইহিস্‌সালাম বদর সমরে এজিদের নানা উতবা এবং তার মামাকে ও তার অন্যান্য আপনজনকে কতল করেছিলেন। যার প্রতিশোধরূপে এজিদ আলে রাসূলদেরকে খতম করেছে। এটা স্পষ্ট কুফরীর প্রমাণ তার এ উক্তি প্রমাণিত হলে এজিদ এজন্যে অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপ এজিদ কবি ইবনে যাবআরীর মুসলমান হওয়ার পূর্বের এক কবিতাখন্ড দ্বারাও এক ধরনের উক্তিকরেছে।[২]

এখানে দেখা যায় এজিদ ইসলামের প্রথম সমরে (বদর যুদ্ধে) তার কাফের পূর্ব পুরুষদের নিহত হওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নবীর খান্দানের লোকজনকে হত্যা করে কারবালার ময়দানে। তাহলে এজিদের অন্তরে নবীর (সঃ) প্রতি দুশমনী প্রতিপালিত হচ্ছিল বলে সাব্যস্ত হয়। যা স্পষ্ট কুফরী। এসব কারণেই কাযী আবু ইয়ালা, আল্লামা ইবনু জাউযী আল্লামা তাফতাজানী, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী এজিদকে কাফের বলেছেন এজিদের প্রতিল'াআনাত করেছেন।[৩]

কর্তিত শির মোবারকের সাথে এজিদের অবমাননাকর আচরণ

قال الحسن (البصرى) لما جيئ برأس الحسين جعل يزيد يطعن بالقضيب - (البداية والنهايه ج٧ ص١٢٢)

"হাসান বছরী (রাঃ) বলেন, যখন ইমাম হোসাইনের শির মোবারক (এজিদের দরবারে) আনা হল, এজিদ তার হাতে বেতের ছড়ি দিয়ে (তাতে) খোঁচা মারতে লাগল।"[১]

উক্ত ঐতিহাসিক ইবনু কাসীর অন্য এক সূত্রে উল্লেখ করেছেন ঃ

..... ومع يزيد قضيب فهو ينكت به فى ثغره ثم قال ان هذا وايانا كما قال الحسين بن الحرام المرى : يفلقن هاما من رجال اعزة علينا وهم كانوا اعق واظلما -

(البدايه والنهايه ج٧ ص١٩٢)

"এজিদের হাতে একটি বেতের ছড়ি ছিল। তা দিয়ে এজিদ হযরত হোসাইনের দাঁত-এর উপর প্রহার করে দাগ বসিয়ে দিল। অতঃপর বলল, এর এবং আমাদের দৃষ্টান্ত হল যেমনটি হোসাইন ইবনুল হারাম মুররী বলেছে ঃ "আমাদের নিকট শক্তিমান বহুজনের মস্তক চৌচির করে ফেলা হয়, এমতাবস্থায় যে তারা অতি নাফরমান ও অত্যন্তজালিম।"[২]

পাঠক মহোদয়! কথায় এবং কাজে এজিদ চরম বেআদবী প্রদর্শন করেছিল হযরত শহীদ ইমাম হোসাইনের খণ্ডিত শির মোবারকের সাথে। প্রথম সূত্রের বর্ণনায় "ত্বাআনা" (طعن) শব্দ এসেছে। অর্থাৎ তার হাতের ছড়ি দিয়ে শির মোবারকে খোঁচা মেরেছিল। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় নাকাতা শব্দটি এসেছে। নাকাতা (نكت) শব্দের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফের টীকায় বলা হয় ঃ

٧.. قوله فينكت اى يضرب فى عينيه وانفه كذا فى الخير

الجارى ١٢ (بخارى.ج١ ص.٥٢)

فينكت অর্থ يضرب অর্থাৎ সে ইমাম হোসাইনের কর্তিত শিরের দু'টি চোখে এবং তাঁর নাসিকায় বেত্রাঘাত করছিল।[৩] হযরত শহীদে কারবালার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল দাঁতের সারিতে আঘাত করে চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল দুরাচার এজিদ। আর গর্বভরে বিজয় গাথা গেয়ে বলেছিল ঃ হযরত হোসাইন নাকি বড় নাফরমান (اعق) এবং চরম জালিম (اظلم) ছিলেন। তাই তাকে কতল করা হল। হযরত ইমাম হোসাইনের ব্যাপারে এজিদের ন্যায় জালিমের নাপাক মুখেই উক্তরূপ কদর্য উক্তি শোভা পেয়েছে। কোন মুসলমান হযরত শহীদে কারবালা ইমামা হোসাইনকে বড় "নাফরমান" বা "চরম জালিম" বলার দুঃসাহস রাখে না। আর এরূপ ইজ্জতের অধিকারী ব্যক্তির মস্তক চৌচির করায় উল্লাস প্রকাশ করতে পারে। না দুঃখের বিষয় হযরত ইমাম হোসাইন শহীদ হলে পর তার মোবারক লাশের উপর দিয়ে জালিম এজিদের অশ্ববাহিনী দাবড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে শহীদে কারবালার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে কারবালর ময়দানে পড়ে থাকে। এসব অত্যাচারের কথায় গর্ব প্রকাশ করেই জালিম এজিদ বিজয় গাথার উক্ত পংতি দু'টি উচ্চারণ করেছে। উল্লাশ প্রকাশ করেছে।

যখন সে উক্ত দম্ভোক্তি করেছিল এবং হযরত শহীদে কারবালার পবিত্র কর্তিত শিরে আঘাত করে নিজ হাতে তাঁকে হত্যা করার আনন্দ উপভোগ করছিল তখন সেখানে নবীর সাহাবী হযরত আবু বারজা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসব সহ্য করতে পারলেন না। ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন ঃ

اتنكت بقضيبك فى ثغر الحسين ؟ اما لقد اخذ قضيبك من ثغره ماخذا لربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشفه - اما انك تجيئ يوم القيمة وابن زياد شفيعك ويجئ هذا يوم القيامة ومحمد صلى الله عليه وسلم شفيعه ثم ولى -
(البدايه والنهايه ج٧ ص١٩٢ - الطبرى ج٥ ص٢٦٨ س١٦ه)

"তুমি কি তোমার ছড়ি দিয়ে হোসাইনের দাঁতের সারিতে আঘাত করে দাগ বসিয়ে দিলে? সারধান! তোমার ছড়িটি তাঁর দাঁতের সারিতে দাগ বসিয়েছে এমন স্থানে

যেখানে মুখ রেখে চুসতে দেখেছি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। জেনে রাখ নিশ্চয় তুমি রোজ হাশরে উপস্থিত হবে আর ইবনু যিয়াদ হবে তোমার জন্য শাফায়াতকারী। আর ইনিও কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবেন। আর তাঁর শাফাআতকারী হয়ে আসবেন খোদ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ কথা বলে তিনি এজিদের দরবার হতে বের হয়ে যান[৪]।"

এই ছিল ইমাম হোসাইনের প্রতি এজিদের শ্রদ্ধাবোধ (?) যাঁরা এজিদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে থাকেন তারা বিষয়টি ভেবে দেখবেন। আল বিদায়া ওয়াননিহায়া প্রণেতাকে উমাইয়্যা বংশের তরফদার বলে দোষারোপ করা হয়। তাঁর গ্রন্থেই এসব অবমাননাকর আচরণের কথার উল্লেখ দেখা যায়। তিনি ইমাম হোসাইনের লাশের উপর অশ্ব বাহিনীর অবমাননার কথাও উল্লেখ করেছেন।

এজিদ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত জামাতের অভিমত

এজিদ কাফের ছিল বলে কোন কোন আলেম মত ব্যক্ত করেছেন। আর তার প্রতি লা'নত করেছেন। সুন্নী আকীদার কিতাব আকাইদ-ই নাসাফীতে বলা হয়েছে যে, ইমাম হোসাইনকে যে কতল করেছে যে, তাঁকে কতল করার হুকুম জারি করেছে, তাঁকে কতল করা জায়েয বলে যে মত প্রকাশ করেছে, এ বিষয়ে যে রাযী রয়েছে, তাদের সকলের প্রতি লা'নত ও অভিশম্পাত করার বৈধতার প্রতি সকল আলেম একমত। আর এজিদ ইমাম হোসাইনকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। এ কর্মে সম্মতি জানায়। তাঁর শহীদ হওয়ার খবরে সন্তোষ প্রকাশ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার আহলে বাইত-এর অপমান করে। এসব কথা ব্যাপক বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত। কাজেই এজিদের প্রতি অভিশাপ দেয়ার বৈধতার প্রশ্নে দ্বিধান্বিত থাকার প্রয়োজন নেই বলে মত প্রকাশ করে আকাইদ-ই- নাসাফীতে বলা হয় ঃ

..... وبعضهم اطلق اللعن عليه لما انه كفر حين امر بقتل الحسين رض واتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امر به او اجازه و رضى به - والحق ان رضا يزيد بقتل الحسين رض واستبشاره بذلك واهانة اهل بيت النبى عليه السلام مما تواتر معناه و ان كان تفاصيله احادا فنحن لانتوقف فى شانه بل فى ايمانه لعنة الله عليه وعلى انصاره واعوا نه .

(شرح العقائد النسفية ص١٦٢)

"কোন কোন আলেম এজিদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেছেন। কারণ এজিদ ইমাম হোসাইনকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে কাফেরের কর্ম করে। আর যে ইমাম হোসাইনকে হত্যা করেছে, যে তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করেছে, যে তাঁকে হত্যা করাকে বৈধ বলে মত পোষণ করেছে, যে এসব কাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেছে-এরূপ লোকজনের প্রতি 'লানত' ও অভিশম্পাত দেয়াকে সকলেই বৈধ

বলেছেন।

আর সত্য কথা হল, এজিদ ইমাম হোসাইনকে হত্যা করার ব্যাপারে রাযী ছিল। তাঁর শাহাদাত বরণের খবরে সে উল্লসিত হয়। সে নবীর পরিবার আহলে বাইতগণের অপমান করে আনন্দিত হয়। এ তথ্যাদি নির্ভুল বর্ণনা পরম্পরায় ব্যাপকভাবে সমর্থিত যদিও সূত্রগত একক বর্ণনা দ্বারা বর্ণিত হয়। কাজেই আমরা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত) এজিদের ব্যাপারে এতটুকু দ্বিধা বোধ করবো না, এমনকি তার ঈমানের প্রশ্নেও না– এজিদের প্রতি লা'নত অভিশম্পাত এজিদের সাহায্যকারীদের প্রতি অভিশম্পাত। এজিদের পক্ষ সমর্থনকারীদের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ।"

(শারহে আকায়েদে নাসাফী ঃ ১৬২ পৃষ্ঠা)

এজিদ ইমাম হোসাইনকে হত্যা করার জন্য হুকুম জারি করে। ইমাম হোসাইনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাঁকে হত্যা করার পদক্ষেপ নেয়। মদীনায় নিযুক্ত উমাইয়্যাদের শাসনকর্তা ওয়ালীদ ইবনু উতবাকে বায়আত আদায়ের নির্দেশ দিতে গিয়ে এজিদ লিখে পাঠায় ঃ

خذ الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن ابى بكر وعبد الله بن الزبير بالبيعة اخذا شديدا ومن ابى فاضرب عنقه وابعث الى برأسه - (مقتل الخوارزمى ج١ ص١٧٨)

"হোসাইনকে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর, আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকর, আব্দুল্লাহ ইবনু যোবাইরকে শক্তভাবে বায়আত করার জন্য পাকড়াও কর। যেই বায়আত করতে অস্বীকার করবে তার মস্তক কেটে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।"

(মাকতাল–ই–খাওয়ারিযমী ১ম খণ্ড, ১৭৮–১৮০ পৃষ্ঠা)

বলাবাহুল্য, এজিদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন হযরত ইমাম হোসাইন। অন্যরা তাঁর পরের প্রতিপক্ষ হতে পারতেন। বায়আত না করলে মাথা কেটে এজিদের দরবারে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ ইমাম হোসাইনের বেলায়ই প্রথমতঃ প্রযোজ্য হয়। ইমাম হোসাইন শাহাদাত বরণ করার পর এবং তাঁর কর্তিত শির মোবারক সামনে রেখে এজিদ বিজয় গাথা গেয়েছিল এবং কর্তিত শিরের সাথে অপমানজনক আচরণ করেছিল। লুণ্ঠিত নবী পরিবারের মহিলাদের সামনে বালক হযরত ইমাম যয়নুল আবদীনের প্রতি অশোভন উক্তি করে এজিদ আলে মুআবিয়াকে আলে রাসূলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করে। এ প্রসঙ্গে সে যে সব উক্তি করে তা দ্বারা আলে রাসূলের অপমান

করে। এ ছাড়া সে ইমাম হোসাইনকে 'আজলাম'আআক্য' অতিজালিম ও চরম অবাধ্য বিদ্রোহী বলেছে, যা ইমাম হোসাইনের প্রতি অবমাননার নামান্তর। এসব কারণে আকাইদে নাসাফীতে এজিদকে কাফের ও লা'নতের উপযোগী ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এজিদের সাথে তার সাহায্যকারীদের প্রতি তার সহযোগী সমর্থকদের প্রতিও লা'নত বর্ষণ করা হয়েছে। এসব উক্তি সুন্নী আকীদার কিতাবেই রয়েছে। বর্তমানকালে যারা এজিদের পক্ষ সমর্থন করে লিখছেন তারাও (انصاره إعوانه) এজিদের মদদগার সাহায্যকারী এবং সমর্থনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন কিনা, ভেবে দেখেছেন কী? এরূপ ভ্রষ্ট লেখক গোষ্ঠী কারবালার ময়দানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য (?) লাভ করতে পারলে হয়তো সরাসরি এজিদ বাহিনীতে যোগদান করতেন। আর ইমাম হোসাইনের রক্তপাতের অংশীদার হতেন, এই যা তফাৎ। একটু সতর্ক হাতে মসি চালনা করুন। অসি চালনার ব্যর্থতার স্থলে মসি চালনা না-ই বা করলেন। অযথা বেহেস্তর সরদার ইমাম হোসাইনের বিরুদ্ধে লিখে চিহ্নিত হতে যাচ্ছেন কেন? নবীর (সাঃ) সাহাবী হযরত আবু বারযাআ (রাঃ)-এর ভাষায় বলতে হয় ঃ রোজ হাশরে কি এজিদ আপনাদের জন্য শাফাআত করতে উপস্থিত হবে, না ইমাম হোসাইনের নানা? (আল বিদায়া ওয়ানা নিহায়া ঃ ৭ম খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এক্ষেত্রে বাহাদুরী দেখানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হোসাইনী ন্যায় নিষ্ঠা ও এজিদী স্বৈরাচারকে সমান্তরালে রাখা যায় না। ইসলামে রাজতন্ত্রের অনুপ্রবেশ এজিদের বাপও এজিদের দ্বারা ঘটেছে এটা ঐতিহাসিক সত্য।

এজিদ প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসীর অভিমত

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এজিদকে ফাসির, কাফিস, মালাউন বলা হয়েছে। তাফসীরকার আল্লামা আলূসী 'রূহুল মাআনী' তাফসীর গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

انا اقول : الذى يغلب على ظنى ان الخبيث لم يكن مصدقا برسالة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم - وان مجموع مافعل مع اهل حرم الله تعالى و اهل حرم نبيه عليه الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين فى الحياة وبعد الممات وما صدرمنه من المخازى ليس باضعف دلالة على عدم تصديقه من القاء ورقة المصحف الشريف فى قذر - ولااظن ان امره كان خافيا على اجلة المسلمين اذ ذالك ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم الاالصبر ليقضى الله امرا كان مفعولا -

ولو سلم ان الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع الكبائر مالا يحيط به نطاق البيان انا اذهب الى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور ان يكون له مثل من الفاسقين -
(روح المعانى ج٢٥ ص٧٣)

"আমি বলছি ঃ আমার এটাই অধিক ধারণা যে, খবীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল বলে বিশ্বাস করত না। সে আল্লাহর হেরেম শরীফে (কাবাপ্রান্তে) অবস্থানকারীদের সাথে, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের হেরেম (মদীনা শরীফে) অবস্থানকারীদের সাথে এবং তাঁর পূত পবিত্র বংশধরদের সাথে তাঁদের জীবদ্দশায় ও তাঁদের মৃত্যুর পরে যে আচরণ করেছে, এছাড়া তার দ্বারা যে সমস্ত অনাচার প্রকাশ পেয়েছে তা তার ঈমান না থাকার প্রতি কুরআনের পাতা বিষ্ঠায় নিক্ষেপ করার তুলনায় দুর্বল ইঙ্গিত বহন করে না। আমার ধারনা তখন তার কার্যকলাপ অধিকাংশ মুসলমানদের নিকট অজানা ছিল না। কিন্তু তাঁরা তখন অসহায় বশিভূত ছিলেন। ধৈর্য ধারণ করা ব্যতীত তাদের জন্য গত্যন্তর ছিল না। আল্লাহর যা করার ছিল তিনি যেন তা করেন।

অগত্যা যদি ধরে নেয়া হয় যে, খবীসটি মুসলমানই ছিল, তাহলে বলতে হয় সে এমন মুসলমান ছিল যে যাবতীয় বড় পাপ একত্র করেছে। যা বর্ণনা করার ভাষা নেই। আর আমার অভিমত হল নাম করে তার মতো ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাদ (লাআনাত) করা বৈধ। তার ন্যায় অন্য কোন পাপীর ধারণা করা যায় না।"[১]

আল্লামা অলুসী একজন সুন্নী তাফসীরকার। তিনি এজিদকে খবীস (خبيث) 'নিকৃষ্ট' পাপী বলে স্মরণ করেছেন। আর তার ঈমান ছিল না বলেই তিনি স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কুরআন অবমাননা করার জন্য কেউ তা বিষ্ঠা পুঞ্জে নিক্ষেপ করলে নিক্ষেপকারীর ঈমান থাকে না। এরূপ ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। আল্লামা আলুসী বলছেন এজিদ এর চেয়েও অবমাননাকর কাজ করেছে হারামাইন শরীফাইনের বাসিন্দাদের সাথে। নবী বংশের লোকজনের সাথে। কাজেই তাকে কাফির বলা যায়। আর এরূপ ব্যক্তির প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে 'লাআনাত' করা যায়। কারণ এজিদের ন্যায় নরাধম পাপিষ্ঠ পৃথিবীতে আর কেই নেই।

যারা এজিদের প্রতি লাআনত করাকে বৈধ মনে করবে না, তাকে পাপী মনে করবে না এরূপ উক্তিকারী এজিদের সহচরদের অন্তর্ভূক্ত বলে আল্লামা আলুসী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।[২] আর তিনি এজিদের সহচরদের প্রতি এজিদের ন্যায় 'লাআনত' করেছেন। তিনি বলেন ঃ

ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة فلعنة الله عز وجل عليهم اجمعين وعلى انصارهم واعوانهم وشيعتهم ومن مال اليهم الى يوم القيامة ما دمعت عين على ابى عبدالله الحسين - (روح المعانى ج٢٥ ص٧٣)

আর লাআনত উপযোগী হওয়ার ব্যাপারে এজিদের সাথে শামিল উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ উমর ইবনু সাআদ এবং তাদের দলবল। তাদের সবার প্রতি আল্লাহ তাআলার লাআনত অভিসম্পাদ। তাদের সাহায্যকারীও শুভানুধ্যায়ী এবং সঙ্গ পাঙ্গদের প্রতি লাআনত। আর যারা তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে তাদের প্রতিও লাআনত কিয়ামতের দিন পর্যন্ত, যতদিন হযরত আবু আব্দুল্লাহ ইমাম হোসাইনের জন্য একটি মাত্র চোখও অশ্রু ঝরাবে-।[৩]

হযরত ইমাম হোসাইনের ব্যাপারটি সহজ নয়। যারা এজিদকে "ইতিহাসের নিপীড়িত ব্যক্তি" বলে সাফাই গাইছেন তারাও আল্লামা আলুসীর মতে লাআনতের যোগ্য। তারাও এজিদের দলভূক্ত, এজিদের শুভানুধ্যায়ী। যাদের প্রতি এজিদের ন্যায় লাআনত করা যায় বলে আল্লামা আলুসী তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর তিনি রাফেযীদেরকে হেয় করার জন্য এজিদের পক্ষ নেয়াকে মুর্খতার নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন রূহুল মাআনী" ২৫ খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা।

এজিদ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবীর (রঃ) অভিমত ঃ

মরহুম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছিলেন বিশিষ্ট একজন বুজুর্গ এবং বিখ্যাত আলেমেদ্বীন। তিনি এজিদ সম্পর্কে তাঁর রচিত ফাতাওয়া এমদাদিয়ায় বলেনঃ

دفع شبہ در شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ -

جواب : یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف فیہ ہے دوسرے صحابہ نے جائز سمجھا حضرت امام نے ناجائز سمجھا اور گو اکراہ مین انقیاد جائز تھا مگر واجب نہ تھا - اور متمسك بالحق ہونے کے سبب یہ مظلوم تھے اور مقتول مظلوم شہید ہوتاہے - شہادۃ غزوہ کے ساتھ مخصوص نہین بس ہم اسی بنائے مظلومیت پر ان کو شہید مانین گے -

باقی یزید کو اس قتال مین اس لئے معذور نہین کہ سکتے کہ وہ مجتہد سے اپنی تقلید کیون کر اتا تھا ..... اس کو تو عداوت ہی تھی چنانچہ امام حسن کے قتل کی بنائے عداوت تھی - اور مسلط کی اطاعت کاجواز الگ بات ہے مگر مسلط ہونا کب جائز ہے -

اس پر خود واجب تھا کہ معزول ہو جاتا خصوصا نااھل کو، پھر اھل حل وعقد کسی اھل کو خلیفہ بناتے - ٦٥ جمادی الاول س١٣٣٦ تمة خامسة ١٥ -

(امداد الفتاذی ج اول ص.٥٣)

– "ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের ব্যাপারে সন্দেহ নিরসন ঃ

উত্তর ঃ এজিদ 'ফাসিক' ছিল। আর ফাসিকের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ বিতর্কিত। অন্যান্য সাহাবারা বৈধ মনে করেন। আর হযরত ইমাম (হোসাইন) নাজায়েয মনে করেন। আর বল প্রয়োগের অবস্থায় মেনে নেয়া বৈধছিল ওয়াজিব ছিলনা। আর ইনি (ইমাম হোসাইন) হক্‌কে মজবুত করে ধরে ছিলেন। সেকারণে তিনি মজলুম ছিলেন। আর মজলুম কতলহলে শহীদ হয়। শাহাদত লাভ কেবল যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কাজেই আমরা মাজলুম হওয়ার কারণে তাঁকে (ইমাম হোসাইনকে) শহীদ মানি।

থাকে এজিদের কথা। আমরা এজিদকে এ যুদ্ধে ক্ষমারযোগ্য বলতে পারি না। কারণ, সে মুজতাহিদ কে। অর্থাৎ ইমাম হোসাইনকে) তার অনুগত করার জন্য কেন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল?..... এজিদতো শত্রুতা পোষণই করছিল। এ শত্রুতাই ইমাম হাসানের হত্যার পেছনে মূলকারণ ছিল। আর বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারীর আনুগত করা অন্যকথা। কিন্তু বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখল করা তো কখনো বৈধ নয়। বিশেষতঃ অযোগ্যতার জন্য এ অযোগ্য ফাসেকের উপর ওয়াজিব ছিল পদত্যাগ করা তখন 'আহলে হাল্ল ও আক্‌দ' তথা নির্বাচকমন্ডলীর লোকেরা কোনযোগ্য ব্যক্তিকে 'খলিফা'বানিয়েদিতেন।"[৫]

হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) তাঁর আলোচ্য ফাতোয়ায় এজিদকে অযোগ্য (نااهل) বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখলকারী (مسلط) বলেছেন। আর বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখল করাকে নাজায়েয বলেছেন। (مگر مسلط هوناکب جائز هے ؟) কাজেই এজিদের ক্ষমতারোহণ মাওলানা থানবী (রঃ)–এর দৃষ্টিতে নাজায়েজ–অবৈধছিল। বস্তুতঃ এজিদ যে ক্ষমতা প্রয়োগে বলপূর্বক ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল একথা আল্লামা সুয়ুতী (রঃ) ও বলেগেছেন। তিনি লিখেছেনঃ

وجعله ابوه ولى عهده واكره الناس على ذالك كما تقدم –

(تاريخ الخلفاء ص١٩١)

অর্থাৎ ঃ আর এজিদের পিতা এজিদকে তাঁর যুবরাজ নিযুক্ত করেন। আর তা মেনে নেবার জন্য জনতার উপর বলপ্রয়োগ করেন।[২]

মরহুম মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) তার উল্লেখিত ফাতোয়ায় হযরত ইমাম হোসাইনকে 'মাজলুম' সাব্যস্ত করেছেন। এ মন্তব্যের অবধারিত ফল হল এজিদ জালেমছিল। জুলুম করা নাহলে কেউ মাজলুম হয় না। কাজেই তাঁর মন্তব্যে এজিদ জালেম বলে সাব্যস্ত হয়। আর আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, জালেম ক্ষমতা ধরের সামনে হক্ কথা বলা উত্তম জিহাদ। ইমাম হোসাইন জালেম এজিদের যুদ্ধক্ষেত্রে এজিদের সেনাবাহিনীর হাতে মজলুম অবস্থায় নিহত হন। কাজেই যথার্থ অর্থেই মাওলানা থানবী ইমাম হোসাইনকে শহীদ বলে ফতোয়ায় উল্লেখ করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে এজিদকে এ লাড়ইয়ে ক্ষমা করা যায় না। কারণ সে মুজতাহিদ ইমাম হযরত ইমাম হোসাইনকে বল প্রয়োগে তার অনুগত করতে চেয়েছিল। মাওলানা আরও বলেন যে এজিদের ইমাম হোসাইনের প্রতিও আক্রোশ ছিল। এরূপ আক্রোশ সে ইমাম হাসানের প্রতিও পোষণ করত। তাঁকেও (বিষ প্রয়োগে) হত্যা করে।

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) বিচক্ষণ মুহাক্কীক আলেম ছিলেন। তাঁর ফতোওয়া লংঘন করে এ যুগের চুনো পুঁটিরা এজিদকে উপযুক্ত শাসক বলতে চায়। তাকে বৈধ আমীরুল মুমিনীন বলে ফেলে। বড়দের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে চাইলে তাদের চেয়ে বড় হওয়ার আবশ্যক রয়েছে। এ যুগে আমরা যারা শায়খুল হাদীস মুফ্তী ও বিষয় বিশারদ রূপে প্রচারনা পাচ্ছি তাদের জন্য পূর্ব পুরুষদের সমীহ করে চলা এবং সাবধানে কথা বলা উচিত। বিশেষতঃ শহীদে কারবালা জান্নাতের যুবকদের সরদার হযরত ইমাম হোসাইনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।। নাপাক, অপবিত্র, এজিদের মোকাবিলায় পবিত্রাত্মা হযরত ইমাম হোসাইনের প্রতি কোনোরূপ অমর্যাদা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায় এমন কাজ কোন ঈমানদার কি কখনো করতে পারে? কুরআনে আহলুল বাইতগণকে পবিত্র বলা হয়েছে।[৩] বিশিষ্ট আলেমগণ এজিদকে নাপাক (پلید) অপবিত্র বলেছেন।[৪] ফাসিক বলেছেন।[৫] চরম পন্থীরা কাফিরও বলে। এজিদ প্রসঙ্গে সামনে আরও আলোচনা আসবে। এজিদকে বৈষয়িক ব্যাপারে যোগ্যতম ব্যক্তি বলে তার পিতাও এজিদ সমর্থক বন্ধুরা প্রচার করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন। এজিদ নৌ যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে বলে তাকে যুদ্ধ বিশারদ প্রমাণ করতে তারা ব্যস্ত! এজিদ নৌ যুদ্ধে সেনানায়ক ছিলো তা তারা প্রকাশ করেন। অথচ একবার তার যুদ্ধ যাত্রার কথার উল্লেখ দেখা যায়। সে যুদ্ধে বড়বড় সাহাবীও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদেরকে সেনানায়ক নিযুক্ত না করে তার পিতা তাকে

নৌসেনা নায়ক নিযুক্ত করেন। একমাত্র পুত্রকে মহাবীর সাব্যস্ত করার জন্য। আর প্রচারণা চালানোর জন্য। এজিদ যদি তেমনযোগ্য ব্যক্তি হত, তাহলে স্থল যুদ্ধেও তাকে বড় বড় অভিযানে প্রেরণ করা হত। আর তার বীরত্ব গাথা দেশময় ছড়িয়ে পড়তো মহাবীর খালিদ ইবনু অলীদের ন্যায়। কিন্তু ইতিহাস নীরব। ইতিহাস কঠিন সমরে এজিদের যোগ্যতার কাহিনী একটিও বর্ণনা করেনি। এটা ইতিহাসের ব্যর্থতাই বলতে হবে। জালিম যিয়াদ ও উবায়দুল্লা ইবনু যিয়াদের কথা, হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফের বীরত্বের কথা ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে। তারিক মহাবীরের দুর্জয় অভিযানের কথাও রয়েছে। কিন্তু এজিদের দৃষ্টান্তমূলক কোন অভিযানের অভাস ইতিহাসে দৃষ্ট হয়না। এটা কি ইতিহাসের কার্পণ্য(?)

আমীর মুআবিয়া (রাঃ) অবশ্য তাঁর পুত্রের কীর্তন গেয়েছেন। বলেছেন হাজারো উসমান-তনয় অপেক্ষা এজিদ নাকি উত্তম! ভালো প্রশাসক ইত্যাদি। হযরত ইবনুসিরীন বলেনঃ এজিদকে স্থালাভিশিক্ত করার সংবাদ পেয়ে হযরত আমর ইবনু হাযম আমীর মুআবিয়ার নিকট গমন করেন। আর এ কর্ম থেকে তাঁকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি আমীর মুআবিয়াকে বলেনঃ

اذكر الله فى امة محمد صلى الله عليه وسلم بمن تستخلف عليها ؟ فقال نصحت وقلت برأيك وانه لم يبق الا ابنى وابنائهم وابنى احق - (تاريخ الخلفاء ص١٩٢)

—"উম্মতে মুহাম্মাদীর ব্যাপারে আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করতে বলছি। আপনি কাকে তাঁদের খলীফা করে যাচ্ছেন? আমীর মুআবিয়া বলেন, তুমি নসীহত করেছো। তোমার ধারণা মোতাবেক কথা বলেছো। প্রকৃত ব্যাপার হলো আমার ছেলে এবং সাহাবাদের ছেলেরা অবশিষ্ট রয়ে যাচ্ছেমাত্র। আর আমার ছেলের অগ্রাধিকাররয়েছে।[৭]"

বলা বাহুল্য। আমীর মুআবিয়ার এ উক্তি ভিত্তিহীন। তখন সাহাবীদের মধ্যেও উপযুক্ত লোকের অভাব ছিলনা। আর তাঁদের ছেলেদের মধ্যে অনেকই এজিদ অপেক্ষা নেক ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ইবনু আব্বাস, ইবনু উমর, ইবনু যোবায়র, আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকর, আর মুআবিয়া সমর্থক সাহাবী মুগীরাহ ইবন শো'বা, আমর ইবনুল আসও জীবিত ছিলেন। আর সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি

ইমাম হোসাইন বর্তমান ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনু হানিফা, ফযল ইবনু আব্বাসও জীবিত ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যোবাইর (রাঃ)-এর বুদ্ধিমত্তার সামনে আমীর মুআবিয়া নিজেই হিমসিম খেয়ে যান। মদীনায় তাঁদের সংলাপ এর জ্বলন্ত প্রমাণ। আমীর মুআবিয়া (রাঃ) এজিদের প্রতি তাঁর শেষ অসিয়াতনামায় বলে যান যে ইবনু যোবাইর শৃগালের ন্যায় চালাক আর আক্রমণে ব্যঘ্যতুল্য। কাজেই তাঁকে মেরে ফেলবে। এমন যোগ্যতম ব্যক্তিবর্গ বর্তমান থাকাসত্ত্বেও তিনি কি করে বলতে পারলেন যে তাঁর অপদার্থ সন্তান এজিদ ছাড়া আর কোন যোগ্য ব্যক্তি নেই! এটাকি সত্যের অপরাপ নয়? পুত্রের পক্ষ নিতে গিয়ে এতদূর অগ্রসর হওয়াটা বিবেকে একটুও বাধেনি।

আমীর মুআবিয়া (রাঃ) আরও বলে ফেলেন যে তাঁর মহান সন্তান (?) এজিদ নাকি গদি পাওয়ার বেশী হকদার! (وابنى احق) খেলাফত কি মামার বাড়ীর মিরাস না বাপের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি? আমীর মুআবিয়া ছলে বলে অর্থদানে বিভ্রান্ত জনকে বশ করে খেলাফতকে রাজতন্ত্রে পরিণত করেন। জীবন সায়াহ্নে তিনি তাঁর ছেলের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতাকে পরিত্যাক্ত সম্পত্তি রূপে রেখে যেতে চান হযরত আমর ইবনু হাযম অত্যন্ত জ্ঞানি ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হয়তো ফাসিক এজিদের বেলেল্লাপনার কথা অবগত ছিলেন। তাই তিনি জনাব আমীর মুআবিয়াকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর ছেলে এজিদকে স্থলাভিষিক্ত না করার উদাত্ত আহবান জানান। তাঁর যুক্তির সামনে হার মানতে গিয়ে তিনি প্রলাপ বকলেনঃ তাঁর ছেলে এজিদ যোগ্য! কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইনের শহীদ হওয়ার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে বিলম্ব না করে মক্কা ও মদীনার আহলে শুরার লোকেরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়েরকে খলীফা নির্বাচিত করেন। এজিদের "বায়আতে আম্মা" (সাধারণ বায়আত) সম্পন্ন হওয়ার আগেই ইবনে যোবাইর খলীফা নির্বাচিত হয়ে যান। এজন্যে এজিদ ওয়াজিববুল্ কতল ছিল।

قال القستلانى : ان ابن الزبير .(رض) لم يرتكب امرا يجب عليه فيه شيئ بل هو اولى بالخلافة من يزيد لانه بويع قبله وهو صاحب النبى صلى الله عليه وسلم -

(بخارى ص٢١ ج١ حاشيه ٦)

-"বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কাস্তলানী বলেছেন ঃ ইবনু যোবাইর কোন অপরাধ করেননি, যার ফলে তাঁর উপর কোনরূপ দন্ডাদেশ অপরিহার্য হতে পারে। বরং

তিনি এজিদের তুলনায় খেলাফতের জন্য উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। কারণ এজিদের আগে তাঁর হাতে বায়আন করা হয়। আর তিনি ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামেরসাহাবী।[৮/১]

বিষয়টি যথা স্থানে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমরা এখানে বলতে চাই যে, জালিম আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের পক্ষ থেকে মহা-জালিম হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফের কাবা আক্রমনের পূর্ব পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনু যোবায়র রাজ্য শাসন করেন। তাঁর শাসনকালে সত্যিকারের খেলাফতে রাশেদার স্বাদ পাওয়া যায়। রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় শৃংখলা ফিরে আসে। এতে তার যোগ্যতার প্রমাণ মিলে। আর এজিদ ক্ষমতায় এসে দেশে রক্তপাত ঘটায়। সারা দেশে অশান্তি দেখা দেয়। মদীনা লুণ্ঠিত হয়। কাবাঘর বিধ্বস্ত হয়। সমগ্র ইসলামী রাজ্যে বহুবিধ অনর্থ ঘটে। এজিদ প্রমাণ করে যে, সে একজন অথর্ব শাসক ছিল। কাজেই আমীর মুআবিয়া কর্তৃক তাকে 'যোগ্য ব্যক্তি' বলা বা হাল যামানার এজিদী লেখক বৃন্দ কর্তৃক এজিদের যোগ্যতার ভূয়ষী প্রশংসা কীর্তন করার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। এসব অবাস্তব স্তুতি-উক্তি মাত্র। মাওলানা থানবী (রঃ)-এর ভাষায় এজিদ না আহল নালায়েক ব্যক্তি ছিল, ছিল সে জালিম ও ফাসিক।

জনাব আমীর মুআবিয়ার সৎ নিয়ত

হযরত আমীর মুআবিয়া কি সৎ নিয়তে এজিদকে ক্ষমতায় বসিয়ে ছিলেন? নাকি পিতৃস্নেহ, তাঁকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা আমরা তাঁর নিজের উক্তির আলোকে যাচাই করব। আমীর মুআবিয়া তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে সুস্থ অবস্থায় এজিদকে যুবরাজ ঘোষণা করেন। এজিদের এ স্থলাভিশিক্তকরণ পিতৃস্নেহের দুর্বলতা বলে লোক মুখে গুঞ্জন ওঠে। তখন তিনি নিজেকে আবিলতা বিমুক্ত সাব্যস্ত করার জন্য জনগণের সামনে ভাষন দান করে বলেন ঃ

قال عطية بن قيس : خطب معاوية فقال : اللهم ان كنت انما عهدت يزيد لما رأيت من فضله فبلغه ما املت واعنه وان كنت انما حملنى حب الوالد لولده وانه ليس لما صنعت به اهلا فاقبضه قبل ان يبلغ ذالك (تاريخ الخلفاء ١٩٢)

—"আতিয়্যা ইবনু কাইস বলেছেন ঃ মুআবিয়া ভাষনদিতে গিয়ে বলেনঃ হে আল্লাহ ! আমি যদি এজিদকে তার যোগ্যতার কারণে অলি–আহাদ (যুবরাজ) বানিয়ে থাকি তাহলে তাকে আমার আশানুরূপ স্থানে পৌছিয়ে দাও। আর তাকে সাহায্য কর। আর যদি তাকে স্থলাভিশিক্ত করার কাজে আমাকে সন্তানের প্রতি পিতার মহব্বত উদ্বুদ্ধ করে থাকে আর সে যদি আমি তাকে যে কাজে নিযুক্ত করেছি তার জন্যযোগ্য ব্যক্তি না হয় তাহলে তাকে তুমি মৃত্যুদান কর এর পূর্বেই।"[৯]

মনতব্য নিষপ্রয়োজন। হযরত আমীর মুআবিয়ার নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং এজিদের অযোগ্যতা উভয়দিক এ দোওয়ার আলোকে অনুধাবন করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। দেওয়াটি এজিদের অযোগ্যতা এবং জনাব আমীর মুআবিয়ার নিয়তের আবিলতা প্রমাণ করে। এজিদ রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হয়। অশান্তি বিস্তারের কারণ হয়। এমনকি জনাব আমীর মুআবিয়া তার প্রতি রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত যে নির্দেশ প্রদান করেন নিজের অযোগ্যতার দরুন সে তা লংঘন করে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

বোধহয় জনাব আমীর মুআবিয়া উক্ত ভাষনের মাধ্যমে নিজেকে নিরপেক্ষ ও নির্দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আর তাঁর কর্মকে সমালোনার কবল হতে মুক্ত করতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ হতে এমন বাক্য উৎসরিত হল যা তাঁর উদ্দেশ্যকে বানচাল করেদিল। আর আল্লাহর দরবারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাষণ দোয়ার আবরণে ঢেকে প্রদান করলেও বিরূপ ফলাফল প্রকাশ পেল।

এজিদ যে নিকৃষ্ট ব্যক্তিছিল তারপর তার ছেলে মুআবিয়া ক্ষমতায় বসেই প্রথম বক্তৃতায় তা প্রকাশ করেদেন।[১০] কিছুদিনের মধ্যেই এজিদের ছেলে মুআবিয়াও অসুস্থ হয়ে মারা যান। আর এজিদের কলংকজনক মৃত্যুর কথা না বলাই শ্রেয়। এরূপে জনাব আমীর মুআবিয়ার পারিবারিক খেলাফত (?) ধ্বংস হয়।

সূত্র সূচী ঃ

১· এমদাদুল ফাতাওয়াঃ ১ম খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা।

২· তারীখুল খোলাফাঃ সায়ূতী–১৯১ পৃষ্ঠা।

৩· আহযাবঃ ৩৩ঃ ৩৩ আয়াত।

৪· তোহ্‌ফা ইসনা আশারিয়া, ১ম বাব, ৮ পৃষ্ঠা। জাবুল কলূবঃ ৩৬ পৃষ্ঠা এমদাদুল ফাতাওয়াঃ ১ম খন্ড ৫৩০ পৃষ্ঠা।

৬· আল্ বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া–এজিদ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৭· তারীখুল খোলাফাঃ মায়ূতী–১৯২ পৃষ্ঠা।

৮ ঐ ঃ ঐ ১৯২ ঐ

৮/১· বুখারীঃ ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা, টীকা নং ৬

৯· তারীখুল খোলাফাঃ ১৯২ পৃষ্ঠা।

১০·

ইসলামী খেলাফতে উত্তরাধিকার চলে না

..... کتاب وسنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ھے اس مین وراثت کا کچھ کام نہین کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ھو - بلکہ ضروری ھے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے -

(شہید کر بلا ص۱۳)

কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি হল ঃ ইসলামী খেলাফত নবুওতের খেলাফত। বাপের পর ছেলে খলীফা হবে এরূপ উত্তরাধিকার এখানে অচল। বরং স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে খলীফা নিযুক্ত করতে হবে।

"মুফতী মুহাম্মদ শফী (রঃ)"

(শহিদ কারবালা ১৩ পৃষ্ঠা)

এজিদের জন্য আগাম বায়আতের বিবরণ

আমাদের বিগত আলোচনায় সাব্যস্ত হল যে, রাজতন্ত্র ইসলাম সম্মত নয়। রাজতন্ত্রকে খেলাফত বলাচলে না। আর মুসলমানদের মধ্যে সর্ব প্রথম আমীরে মুআবিয়ার দ্বারা এ বেদআতের অশুভ প্রবেশ ঘটে। তিনি কিভাবে খেলাফতের সনাতনী ব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করে ছিলেন এখানে তার কিঞ্চিত আলোচনা করা যায়।

অবৈধভাবে আমীর মুআবিয়া সিরিয়ায় ৩৭ হিজরী সালে খেলাফতের দাবী করেন। আর ৫০ হিজরী সালে সিরিয়াবাসী সভাসদবর্গ ও আমলা পরিবেষ্টিত পরিবেশে এজিদের জন্য আগাম বায়আত গ্রহণ করেন। পরে তিনি ৬০ হিজরী সালে মৃত্যু বরণ করেন। তার অর্থ দাঁড়ায় তিনি তাঁর মৃত্যুর ১০ বছর পূর্বে ছেলে এজিদকে ক্ষমতায় বসানোর সূচনা করেন। আর আগাম বায়আত গ্রহণের বেদআত জারি করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতা লিখিত তারিখুল্ খোলাফায় বলা হয় ঃ

وفيها (اى فى سنة خمسين) دعا معاوية اهل الشام ..... الى البيعة بولاية العهد من بعده لابنه يزيد فبايعوه وهو اول من عهد بالخلافة لابنه واول من عهد بها فى صحته - (تاريخ الخلفاء للسيوطى ١٨٣)

—"আর এ বছরই (৫০ হিজরীসালে) মুআবিয়া তাঁরপর তাঁর ছেলেকে রাষ্ট্র প্রধান করার অংগীকার করার জন্য সিরিয়া বাসীদেরকে আহবান জানান। তারা তখন বায়আত করে। মুআবিয়া হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজ ছেলের জন্য খেলাফতের অংগীকার করার বায়আত নিলেন। তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সুস্থ অবস্থায় খেলাফতের ব্যাপারে আগাম অংগীকার নিয়ে যুবরাজ–অলিয়ে আহাদ নিযুক্ত করলেন।"১ (তারিখুল্ খোলাফাঃ ১৮৩ পৃঃ)

এখানে লক্ষণীয় যে, ছেলের পক্ষে অগ্রিম বায়আত নেয়ার প্রথা পূর্বে ইসলামে ছিল না। আর সুস্থ অবস্থায় বর্তমান খলীফা পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করে যাওয়ার রীতিও ইসলামে ছিল না। এ সবই আমীর মুআবিয়ার নব সংযোজন ও বেদআত। আল্লামা সয়ূতী এ কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ এ পন্থায় ক্ষমতায় থেকে বংশধরদের জন্য ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখে যাওয়ার পাঁয়তারা করা হয়। যা ইসলামী গণরায়ের মূলনীতির পরিপন্থী। আমীর মুআবিয়ার এ প্রয়াস ইসলামের সনাতনী নির্বাচন পদ্ধতিকে

ব্যাহত করে। ফলে বনু উমাইয়্যা ও বনু আব্বাসদের শাসনামলে গোত্রতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। অমুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত রাজতন্ত্র এভাবে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। ইমাম হোসাইন নবীর সুন্নতের এ বিকৃতি প্রতিরোধকল্পে তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। আর কারবালার ময়দানে প্রাণ দিয়ে তা প্রতিহত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। ইতিপূর্বে হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ)-এর উদ্ধৃতিতে এ কথা বলা হয়েছে। আমীর মুআবিয়া প্রবর্তিত এ বেদআতের দরুণ খলীফা নির্বাচনের জন্য জনগণের রায় নেয়ার নিয়ম বন্ধ হয়ে যায়। আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বৈরাচারের অনুপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়। জনগণের রায়েরভিত্তিতে শাসক পরিবর্তনের কোনো উপায় থাকে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয় গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস। এর জবাবে চলতে থাকে ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার ও নিপীড়ন। আর অত্যাচার ও নিপীড়নের পতন অনিবার্য। তাই দেখা যায় আব্বাসী স্বৈরচার অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করে নেয় অস্ত্রের সাহায্যে। কারণ গণরায়ের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করার কোন পথ উমাইয়্যা স্বৈরাচার খোলা রাখেনি।

হযরত আমীর মুআবিয়ার উক্তরূপ সংযোজনের প্রতি সাহাবাদের সমর্থন ছিলনা। আর এ অনভিপ্রায় কর্ম ইসলামের কেন্দ্রস্থল মদীনা বা মক্কা থেকে শুরু হয়নি। হয়েছে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক থেকে। তাও স্বৈরশাসনের তত্ত্বাধানে মুহাজিরীন -আউয়ালীন, আনসার ও আসহাবে বদর বা বায়্যাত-ই-রিদওয়ানের অন্তর্ভূক্ত নবীর (সঃ) সাহাবীদের সমর্থনে যুবরাজ গড়ার এ প্রথা চালু হয়নি। তখনও বায়আতে রিয়ওয়ান এ অংশগ্রহণকারী নবীর সাহাবাগণের অনেকে জীবিত ছিলেন। আনসার ও মুহাজিরদের উল্লেখযোগ্য অংশ বিদ্ধমান ছিল। "তারাই ছিলেন 'আহলে শুরা' যাদেরকে আমীর মুআবিয়া উপেক্ষা করে বিপরীতপক্ষে তিনি তোলাকাদেরকে অগ্রাধিকার দেন।

এজিদের জন্য আগাম বায়আত সংগ্রহ করার সময় আমীর মুআবিয়া সুস্থ ও সক্ষম ছিলেন। আল্লামা সুয়ূতীর বরাতে আমরা তা বলে এসেছি। সুস্থ ও সক্ষম থাকা অবস্থায় এজিদের জন্য আগাম বায়আত গ্রহণের কোনই প্রয়োজন ছিল না। তাও জনাব আমীর মুআবিয়ার মৃত্যুর দশ বছর পূর্বে এরূপ অহেতুক জবরদস্তিমূলক বায়আত নেয়ার কোন বৈধতাছিলনা। হাঁ, সন্তান প্রীতির তীব্র অনুভূতি থাকলে অন্য কথা। এ ফিতনা সৃষ্টি করেছিলেন তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। ইসলামের কেন্দ্রস্থল হতে বহুদূরে এ সড়যন্ত্রের জন্ম হয় সিরিয়াতে। সেখানে থেকেই বিভিন্ন প্রদেশে এজিদের পক্ষে বায়আত নেয়ার ফরমান জারি করা হয়। আর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের তত্ত্বাবধানে বশংবদদের দ্বারা প্রতিনিধি দল সাজিয়ে দামেস্কে প্রেরণ করা হয়। তারা সরকারী পৃষ্ঠপোশকতা, অনুগ্রহ ও অনুদান লাভের বদলা চুকাতে গিয়ে এজিদের প্রতি সমর্থন জানায়। কিন্তু

এতসব করেও আমীর মুআবিয়া পার পাননি। মক্কা ও মদীনা এবং নবীর (সঃ) উল্লেখযোগ্য সাহাবীগণ তাঁর এ প্রয়াসে সায়দেননি। এমনকি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) কে এসব ব্যাপারে কিছুটা শিথিল ছিলেন বলে বলা হয়। আমীর মুআবিয়া তাঁকে দিয়েও এজিদের পক্ষে সমর্থন যোগাড় করতে পারেননি। আমরা একটু পরেই এ প্রসঙ্গে আসছি। তিনি তখন তাড়াহুড়া করে মক্কা ও মদীনায় গমন করা শ্রেয় মনে করেননি। মক্কা ও মদীনাবাসীরা 'না' বলে দিলে অন্যান্য এলাকাবসীরা আসকারা পেয়ে যেত। তারাও আগাম বায়আতে রাযী হতনা। তাই প্রায় এক ধরনের প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করেন হযরত আমীর মুআবিয়া। মক্কা ও মদীনাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য এলাকার প্রতিমনোনিবেশ করেন। আর তাঁবেদারদের দ্বারা সমর্থন কুড়াতে থাকেন। অবশেষে তিনি মদীনায় তাঁর পক্ষে কর্মরত ও নিযুক্ত মারওয়ান ইবনুল হাকামকে এজিদের পক্ষে বায়আত গ্রহণের তাগিদ দিয়ে পত্র লেখেন। মারওয়ান কাজটিকে কঠিন ভাবে তবু নির্দেশ কার্যকর করতে অগ্রসর হয়। এ প্রসঙ্গে তারিখুল খোলাফায় বলা হয় ঃ

ثم انه كتب الى مروان بالمدينة ان يأخذ البيعة فخطب مروان فقال : ان امير المؤمنين رأى ان يستخلف عليكم ولده يزيد سنة ابى بكر وعمر فقام عبد الرحمن بن ابى بكر الصديق فقال : بل سنة كسرى وقيصر ان ابابكر و عمر لم يجعلاها فى اولادهما ولا فى احد من اهل بيتهما -

(تاريخ الخلفاء ١٨٣)

—"অতঃপর আমীর মুআবিয়া মদীনায় মারওয়ানের নিকট পত্র লেখেন মারওয়ান যেন এজিদের জন্য 'বায়আত' সংগ্রহ করে। এ পত্র পেয়ে মারওয়ান এক ভাষণ দেয়। ভাষণে বলে ঃ নিশ্চয় আমীরুল মুমিনীন (মুআবিয়া) তাঁর ছেলে এজিদকে আপনাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করতে সাব্যস্ত করেছেন। এটা আবু বকর ও উমরের নীতি। এ কথা শুনা মাত্র তৎক্ষণাত হযরত আবু বকরের ছেলে হযরত আব্দুর রাহমান দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ বরং এটা রোমান ও পারস্য সম্রাটদের-নীতি। নিশ্চয় আবু বাকর ও উমর খেলাফতকে তাঁদের সন্তানদের উত্তরাধিকার করে যাননি।"[২] এমনকি তাঁদের খান্দানের কারো জন্য ও করে যাননি।[২/১]

এখানে এসে আমীর মুআবিয়ার যাবতীয় ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে গেল। মদীনাবাসীরা তাঁকে সমর্থন দিল না। জীবিতাবস্থায় সন্তানদের জন্য 'খলিফা' হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াস চালাননি খলিফা আবু বাকর ও উমর। তাঁরা নিজেদের বংশধরদের জন্য এমন কাজ করে যাননি। তাই তাঁদের অজুহাত দাঁড় করিয়ে নিজের সন্তানকে আগাম খলীফা পদে প্রতিষ্ঠিত করার কোন অবকাশ থাকে না। খেলাফত রাজরাজরার রাজ্যধিকার নয়। যা তাদের সন্তানদের প্রাপ্য বলে গণ্য হবে। ইসলামে রাজতন্ত্রের ঠাঁই নেই। নেই রাজার অস্তিত্ব। এটা কায়সার ও কিসরার নীতি যা ইসলামে প্রবর্তন করা যাবেনা। হযরত আবু বাকরের ছেলে হযরত আব্দুর রাহমান স্পষ্টভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। জনতা তাঁর পক্ষে ছিল। মারওয়ান দেখতে পেল, সব ষড়যন্ত্র ভন্ডুল করেদিচ্ছেন আঃ রহমান। তখন সে তার পাইক পেয়াদাদেরকে বলেঃ আবদুর রহমানকে পাকড়াও কর। হযরত আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকর তখন দৌড়িয়ে হযরত আয়েশার ঘরে অর্থাৎ রাসূলের রওযা মোবারকে আশ্রয় নেন। মারওয়ান নিরুপায় হয়ে হযরত আবদুর রাহমানকে গালমন্দ বলতে থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে যেমন কুকুর তেমন মুগুর মেরে প্রতিহত করেন। ইতিহাসে তার বিস্তারিত বিবরণরয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, অলী আহাদ বা যুবরাজপ্রথা কাফেরদেরপ্রথা, ইসলামের প্রথা নয়। আর এ ক্ষেত্রে হযরত আবু বাকর বা উমরের বরাত দেবার কোন উপায় নেই। তাঁরা নিজেদের বংশের বা পরিবারের লোক জনের জন্য এরূপকরে যাননি, যা আমীর মুআবিয়া করতে যাচ্ছিলেন।

মারওয়ানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর খোদ আমীর মুআবিয়া ৫১ হিজরীতে হজ্জ উপলক্ষে মক্কা ও মদীনায় আসেন। উদ্দেশ্য ছিল মক্কা ও মদীনাবাসীকে আগাম বায়আতে রাযী করানো। আমীর মুআবিয়া মদীনায় আগমন করে সর্ব প্রথম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমরকে ডেকে পাঠান। অনৈক্য সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁকে বলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে দিয়ে এজিদের সমর্থন আদায় করে নেয়া। আমীর মুআবিয়ার প্রস্তাবের উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার পর বলেন ঃ

اما بعد فانه قد كان قبلك خلفاء لهم ابنآء ليس ابنك بخير من ابنائهم فلم يروا فى ابنآئهم مارأيت فى ابنك ولكنهم اختاروا للمسلين حيث علموا الخيار - وانك تحذرنى ان اشق

عصا المسلمين ولم اكن لافعل وانما انا رجل من المسلمين فاذا اجتمعوا على امر فانما انا رجل منهم -

(تاريخ الخلفاء ١٨٣ للسيوطى)

— "অতপরঃ নিশ্চয় তোমার পূর্বে খলিফাদের আগমন ঘটেছে। তাঁদের পুত্র সন্তান রয়েছে। তোমার পুত্র তাদের চেয়ে উত্তমনয়। তবু তাঁরা তাঁদের পুত্র সন্তানদের জন্য ওই সুযোগ দেখেনি যা তুমি তোমার পুত্রের জন্য দেখছো। তবে তাঁরা মুসলমানদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং তাঁরা তাঁদের কল্যাণ পছন্দ করেন। আর তুমি আমাকে অনৈক্য সৃষ্টি করার ভয় দেখাচ্ছ। আমি তা করতে যাব না। আমি মুসলমানদের একজন। তারা যখন কোন ব্যাপারে একত্র হয়ে যাবে, আমি তাদেরই সাথে থাকব"[৪]

লক্ষ্য করার বিষয়। হযরত ইবনু উমর আমীর মুআবিয়ার কথায় সায় দেননি। বলেছেন আমীর মুআবিয়ার পদক্ষেপ পূর্ববর্তী 'খলিফাদের কার্যকলাপের পরিপন্থী। তাঁদের সন্তানরা এজিদ অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। তবুও তাঁরা তাঁদেরকে খিলাফত দ্যান করে যাননি। তাঁরা মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ দেখেছেন। তাই পুত্র পক্ষ না নিয়ে উম্মাহর সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। পরে তিনি বলেনঃ সকল মুসলমান যা গ্রহণ করবেন তিনিও তামেনে নেবেন, বিরোধ করবেননা। অর্থাৎ খেলাফতের ব্যাপারে সর্ব সম্মত মত তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। একক প্রয়াসে তাঁর সমর্থন নেই। এভাবে তিনি এজিদের বায়আত এড়িয়ে যান।

অতঃপর আমীর মোআবিয়া হযরত আবু বাকরের ছেলে হযরত আব্দুর রাহমান (রঃ)কে ডেকে পাঠান। তিনি এ বিষয়ে পূর্বেই মারওয়ানের সাথে প্রকাশ্যে মত বিরোধ করেছিলেন। একথা আমীর মুআবিয়ার জানাছিল। হযরত আবদুর রহমান উপস্থিত হলে তাঁকে লক্ষ্য করে আমীর মুআবিয়া তাঁর বক্তব্য রাখতে যাচ্ছিলেন মধ্যখানে কথা কেটে তিনি আমীর মুআবিয়াকে বলেন ঃ

... لو وددت انا وكلناك فى امر ابنك الى الله وانا والله لانفعل والله لتردن هذا الامرشورى فى المسلمين اولنعيدنها عليك جزعة ثم وثب ومضى -

(تاريخ الخلفاء ١٨٣ للسيوطى)

-"তোমার আকাঙ্খা হল আমরা যেন তোমাকে তোমার ছেলের ব্যাপারে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাদের পক্ষের ক্ষমতা অর্পণ করেদেই। আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি তা আমরা কোনক্রমেই করবনা। আল্লাহর নামে কসম করে বলি ব্যাপারটিকে তুমি মুসলমানদের শুরায় ফিরিয়ে দেবে অবশ্যই। তানা করলে আমরা তোমার মতের বিরুদ্ধে বিষয়টিকে সংগীন করে তুলবো। একথা বলে আবদুর রহমান ত্বরিৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং বের হয়ে গেলেন।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আবীবাকর ছিলেন স্পষ্টভাষী। তিনি খেলাফতের ব্যাপারে জনগণের রায়ের অধিকার চূড়ান্ত বলে মত প্রকাশ করে চলে গেলেন। এজিদকে সমর্থন দিলেননা। হযরত আব্দুর রাহমান ইবনু আবী বাকর চলে যাওয়ার পথে তাঁকে লক্ষ্য করে আমীর মুআবিয়া ভীতি প্রদর্শন করে বললেন। সন্ধ্যার আগেই যেন তুমি বায়আত করেছ বলে আমরা খবর পাই। তানাহলে সিরীয় ফৌজ হয়তো আমাদের খবর পাওয়ারা পূর্বেই তোমার জীবন লীলা সাংগ করে দেবে।"[৬]

এজিদের পক্ষে সমর্থন আদায়ের ধরণ কেমন ছিল এবার একবার লক্ষ্য করুন। আমীর মুআবিয়ার ধমকের মধ্যে সিরিয়বাহিনীর উল্লেখ তা সুস্পষ্ট করে দেয়।

আব্দুর রহমান চলে যাওয়ার পর আমীর মুআবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়ের (রঃ) কে ডেকে পাঠান। তিনি আসলে তাঁকে চোখ রাঙিয়ে বলেনঃ

"ওহে যোবায়েরের ছেলে। তুমিতো একটি অতি ধাপ্পাবাজ শেয়াল। এক গর্ত থেকে বের হলে অন্য গর্তে ঢুকে পড়ো। তুমিই ওই দু ব্যক্তিকে ইচ্ছা করে নষ্ট করেছ। তাদের নাকে ফুঁকিয়ে দিয়েছ ষড়যন্ত্রের মন্ত্র। তাদের মতের বিরুদ্ধে তাদেরকে তুমিই ক্ষেপিয়েছ। এসব ধমকের জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যোবায়ের বলেনঃ খেলাফতের কার্যাদি পরিচালনায় তোমাকে বিরক্তি পেয়ে বসে থাকলে তুমি খেলাফত ছেড়ে সরে দাঁড়াও। পরে তোমার ছেলের ব্যাপার আন। তার বায়আত নিয়ে আমরা ভেবে দেখব। চিন্তাকর, তোমার সাথে কি আমরা তোমার ছেলের জন্য বায়আত করতে পারি? যদি তা করা হয় তাহলে আমরা কার হুকুম মেনে চলব? তোমার, না তোমার ছেলের? তোমাদের দুজনের বায়আত রক্ষা করা যাবে না।"[৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়ের আমীর মুআবিয়া (রঃ) কে আরও বলেছিলেনঃ খেলাফতের ব্যাপারে আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করুন। তিনি কারো পক্ষে খেলাফতের ঘোষণাদিয়ে যাননি। আপনিও তাই করুন।

ব্যাপারটি মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিন। আপনার পর তারাই তাদের আমীর নিযুক্ত করে নেবেন। আর তা না করতে চাইলে হযরত আবু বাকরের নীতি অবলম্বন করুন। তিনি সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে তার বংশ ও গোত্রের বাইরের এক ব্যক্তির জন্য খেলাফতের শুপারিশ করে যান। হযরত উমর তাঁর সন্তান বা গোত্রের লোক ছিলেন না। তদুপুরি তিনি ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। আপনিও অনুরূপভাবে আপনার ছেলে ও গোত্রের লোকদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তির নাম খেলাফতের জন্য ঘোষণা করে যান। যদি তাও আপনার মনঃপুত না হয় তাহলে হযরত উমরের নীতি অবলম্বন করুণ। তিনি তাঁর জীবনসায়াহ্নে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করে যান। আর তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমরকে এ শর্তে যে, তাঁকে খলীফা করা হবে না, ছয়জনের মধ্যে সমান সমান ভাগে বিভক্তি এসে গেলে যে কোন পক্ষে সমর্থন জানিয়ে চূড়ান্ত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আপনিও তাই করুন। এজিদকে নির্বাচকমণ্ডলীভূক্ত করে যান। কিন্তু সে খলিফা হতে পারবে না। আমীর মুআবিয়া এর কোন যুক্তি গ্রহণ করেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যোবায়রকে ভীতি প্রদর্শন করে চলে যান।"[৮]

বস্তুতঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়র হযরত আমীর মুআবিয়াকে খোলাফা-ই-রাশেদগণের সুন্নত মেনে চলার পথ দেখান। হযরত মুআবিয়া তা মেনে নিতে রাযী হননি। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীসে নির্দেশ রয়েছেঃ ইত্তাবিউ সুন্নাতি ওয়া সুন্নাতাল্ খোলাফাইর রাশিদীনাল্ মাহ্দিয়্যিন। তোমরা আমার এবং খলীফা রাশেদীনের নীতি মেনে চলবে।" কিন্তু আমীর মুআবিয়া তার বরখেলাফ করেন। আর হযরত আবু বাকরের আমল দ্বারা গলদ ফায়দা অর্জনের চেষ্টা করেন। অথচ তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় অনুরুদ্ধ হয়ে পরবর্তী খলিফার নাম ঘোষণা করেছিলেন। আমীর মুআবিয়ার ন্যায় দশ বছর আগেই নিজের ছেলের জন্য খেলাফতের পথ নিষ্কন্টক করার জন্য সরকারী ক্ষমতার অবৈধ প্রয়োগ করেননি।

হযরত আমীর মুআবিয়ার বিতর্কিত ভাষণ

আমীর মুআবিয়া ধুরন্ধর কূটনৈতিক ছিলেন। তিনি মদীনায় এসে দান খায়রাতের ভান্ডার খুলে দেন। সাধারণ মানুষের মন আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। একদিন হযরত হোসাইনসহ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যোবায়র আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাকর প্রমুখকে তাঁদের মনতুষ্টির জন্য ডেকে পাঠান। তাঁরা আসার

পর তাদেরকে উপঢৌকন দেন। মূল্যবান জামা কাপড়ে বিভূষিত করেন। তাঁদেরকে নিয়ে মসজিদে নবীতে প্রবেশ করেন। মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁদেরকে শাসিয়ে বলেনঃ আমি একটি ভাষণ দেব। কেউ আমার ভাষণের প্রতিবাদ করতে পারবে না। প্রতিবাদ করলে মস্তক উড়িয়ে দেব। এ সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন, আর খুত্‌বা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

انا وجدنا احاديث الناس ذات عوار زعموا ان ابن عمر وابن ابى بكر وابن الزبير لن يبايعوا يزيد وقد سمعوا واطاعوا وبايعوا له ثم نزل الخ - (تاريخ الخلفاء للسيوطي ١٨٤)

—"আমরা লোকজনের কথাবার্তা বিশৃংখল পেয়েছি। লোকেরা মনে করে আব্দুল্লাহ ইবনু উমর, আব্দুর রহমান ইবনু আবু বাকর, আবদুল্লাহ ইবনু যোবায়র এজিদের জন্য বায়আত করেনি। তবে তারা অবশ্যই কথা মেনে নিয়েছে অনুগত হয়েছে, আর এজিদের পক্ষে বায়আত করেছে।

—ভাষণ দিয়ে তিনি মিম্বর হতে নেমে যান।"

মিম্বর থেকে নেমে তিনি আর কাল বিলম্ব না করে দামেস্কের উদ্দেশ্যে চলে যান। এদিকে লোকদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে ঃ

فقال الناس بايع ابن عمر وابن ابى بكر و ابن الزبير وهم يقولون لا والله ما بايعنا - (تاريخ الخلفاء ١٨٤)

" লোকেরা বলেঃ ইবনু উমর, ইবনু আবীবাকর, ইবনু যোবায়র বায়আত করেছেন। আর তারা বলতে থাকেন ঃ না, আল্লাহর কসম আমরা বায়আত করিনি।"[৯]

অবাক বিস্ময়ে স্তব্দ হয়ে যাবার মতো ব্যাপার। এতো বড় ধোঁকাবাজি করা হল শুধু এজিদের অবৈধ রাজ্য শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। জানি না এসব ইসলামে কি করে বৈধ হতে পারে? যা হোক, এ ছিল উমাইয়্যাদের আমলে রাজনীতির স্বরূপ। এরূপ অন্যায় দীর্ঘ ২০টি বছর একাধারে চলতে থাকে। যে প্রতিবাদমুখর হয়েছে, তাকেই ধরা লোক থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। নতুবা স্বর্ণমুদ্রার লেগাম পরিয়ে অনুগত করা হয়েছে। ঘুষ উৎকোচ ও অর্থের যদেচ্ছা বিতরণ

জানতে হলে দেখুন আবু দাউদ শরীফঃ ২য় খণ্ড ৪১১ পৃষ্ঠা, বাযলুল্ মাজহুদঃ ৪র্থ খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা, মুসলিম শরীফঃ ২য় খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা বাবুল ইমারাহ।

বস্তুতঃ এজিদ ছিল মুআবিয়া শাসনের নির্যাস। আমীর মুআবিয়া তাকে অবৈধভাবে ক্ষমতায় বসিয়ে যান। এরূপে ইসলামী খেলাফতের বিকৃতি সাধিত হওয়ার উপক্রম হয়। এজিদকে বিনা বাধায় রাজত্ব করতে দেয়া হলে আজ ইসলামের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে বিশ্ববাসী বিভ্রান্ত হয়ে যেত। তারা মনে করত কোন স্বৈরশাসনকে ধর্মের আবরণে আবৃত করে পেশ করতে পারলেই তা ইসলামী খেলাফতে পরিণত হয়ে যায়। ইমাম হোসাইনের পূর্বে বর্ণিত ভাষণটি এ ধারণা খণ্ডন করে। আর ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের লক্ষ্য স্থির করে। হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) কুফাবাসীদের নামে কূফা যাত্রাপথে যে পত্র লেখেন তা পাঠ করলে খেলাফতে ইসলামীর স্বরূপ কি তা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি তাঁর পত্রে লেখেন ঃ

স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় ইমাম হোসাইন!

..... فلعمرى مالامام الا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام -

(الطبرى ص١٩٨ ج٥ س.٢٠)

"----------অতঃপর; আমি দৃঢ়ভাবে বলছিযে, ইমাম বলতে একমাত্র এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে কুরআন মোতাবিক চলে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, ন্যায় বিষয়কে মেনে নেয়, আর আল্লাহর সন্তা নির্ভর হয়। তোমাদের প্রতি সালাম।"[১০]

ইসলামী খেলাফতের বৈশিষ্ট্য ইমাম হোসাইন তাঁর এ পত্রে তুলে ধরেছেন। প্রথম কথা হল খালীফা ইমাম হতে হলে কুরআনের অনুসরণ করতে হবে। কার্যকলাপে ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। সত্য ও ন্যায়ের সামনে মাথা নতকরে দিতে হবে। আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হতে হবে। বলাবাহুল্য উমাইয়্যা শাসনামলে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করা হতো না কিতাবুল্লাহর অনুশাসন মেনে চলা হত না। তারা হালালকে হারাম হারামকে হালালে পরিণত করে ফেলতো। অন্যায় তাদের স্বার্থের অনুকূলে হলে তা গ্রহণ করত।

আর ন্যায়ও যদি তাদের স্বার্থের হানি করতো তা এড়িয়ে যেতো। এজিদের ব্যাপারে ন্যায় ভিত্তিক প্রস্তাবগুলো তারা এড়িয়ে যায়। আর অন্যায়ের দিকে অগ্রসর হয়। ইমাম হোসাইন অপর এক পত্রে কূফাবাসীদেরকে তাঁর সংগ্রামের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

.... وقد بعثت رسولی الیکم بهذا الكتاب وانا ادعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فان السنة قد اميتت وان البدعة قد احييت فان تسمعوا قولى وتطيعوا لامری اهدکم سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله -

(الطبری ج٥ ص۲۰۰)

"........ আর আমি তোমাদের প্রতি আমার প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিয়েছি, এ পত্র সাথে দিয়ে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকছি, তাঁর নবীর তরীকার প্রতি আহবান করছি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কারণ, সুন্নাতের অপমৃত্যু ঘটানো হয়েছে। আর বিদআতকে সজীব করে তোলা হয়েছে। তোমরা যদি আমার কথা শোন, আমার নির্দেশ মেনে নাও তাহলে আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। তোমাদের প্রতি শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।"[১১]

ইমাম হোসাইনের (আঃ) এ পত্রে তাঁর সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিষ্কার ভাবে সামনে এসে গেছে। এতে সমাজের বিচ্যুতির কথাও ফুটে উঠেছে। তাঁর সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে কুরআনের শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। নবীর সুন্নত মোতাবিক চলার দাওয়াত দেয়া। উমাইয়্যাদের কুশাসনে নবীর আচরিত নীতির মৃত্যু ঘটেছিল। আর ইসলাম বিরোধী বেদাআতী কর্ম দানাবেঁধে উঠেছিল। ইমাম হোসাইন এ অবস্থার পরিবর্তন চাচ্ছিলেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনই ছিল তাঁর কাম্য। শুধু ক্ষমতা দখল বা সম্পদ ভোগ করে আরামে জিন্দেগী কাটিয়ে দেয়া তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল না। এ লক্ষ্য থাকলে মদীনায় বসেই তিনি উমাইয়্যাদের সাথে হাত মিলিয়ে তা লাভ করতে পারতেন।

ইরাক অভিমুখে ইমাম হোসাইন

আমরা পূর্বে বলেছি যে, ইরাক তথা কূফায় উপস্থিত হওয়াই ছিল তখনকার পরিস্থিতিতে একমাত্র পথ। সামরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ইমাম হোসাইনের জন্য ইরাক তথা কূফা অপেক্ষা অন্যকোন স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। নিরাপদও ছিল না। আর হিজাযে অবস্থান করাতো মোটেই সম্ভব ছিল না। এজিদ পত্র লিখে বল প্রয়োগে ইমাম হোসাইনের বায়আত আদায় করার হুকুম দিয়ে ছিল। যে কোন মূল্যে ইমাম হোসাইনকে বশ করার নির্দেশ পাঠিয়ে ছিল। এরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েই ইমাম হোসাইন হিজায ছেড়ে চলে যান।

তিনি যখন মক্কা ছেড়ে চলে যান তখন এ সংবাদে মক্কার তৎকালীন শাসনকর্তা আমর ইবনু সাঈদ (উমাইয়্যা বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি) পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকে নিবৃত্ত করা আমর ইবনু সায়ীদের লোকদের পক্ষে সম্ভব হল না। তিনি এগিয়ে চললেন। আমর ইবনু সাঈদের লোকেরা বললো ঃ 'হোসাইন। এ জাতির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। ইমাম হোসাইন এজিদী স্বৈরাচারের এসব বশংবদদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

لى عملى ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريئ مما تعملون - (الطبرى ج٥ ص٢١٨ س.٥٦)

"আমার কার্যের জন্য আমি দায়ী। আর তোমাদের কার্য কলাপের জন্য তোমারা দায়ী। আমার কার্যাদির দায়িত্ব হতে তোমরা মুক্ত। আর আমি তোমাদের কার্য কলাপের দায়িত্ব বহন করা হতে বিমুক্ত।১

বস্তুত ঃ ইমাম হোসাইন (রাযিঃ) তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অতীতকালের নবীদের সত্য নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ - اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْئٌ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ - (يونس : ٤١)

"তারা যদি তোমাকে অবিশ্বাস করে তাহলে বলে দাও ঃ আমার কাজের

দায়–দায়িত্ব আমার। তোমাদের কাজের দায়–দায়িত্ব তোমাদের। আমি যা করি তার দায় থেকে তোমরা মুক্ত। আর তোমরা যা করছ তা থেকে আমি দায় মুক্ত।"[২]

অর্থাৎ ঃ ইমাম হোসাইন বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর বর্তমান সংগ্রাম নবীর দ্বীন তথা নবীর নিয়ম–পদ্ধতি ও সুন্নতের হিফাযতের উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছে। এর দায়–দায়িত্ব একমাত্র তাঁর উপর ন্যস্ত। আর যারা তাঁর প্রতিপক্ষ তাদের কার্য কলাপ রাসূলের নিয়ম–পদ্ধতির পরিপন্থী আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে। ঐক্যের দোহাই পেড়ে নবীর তরীকা বিরোধীদেরকে সমর্থন করার কোন অর্থ হয় না। ঐক্যের নির্দেশ ইসলামের নির্দেশ। যেখানে ইসলাম বিরোধী আচরণ করা হচ্ছে সেখানে ঐক্যের সাক্ষাৎ ফায়দা ইসলামী আচরণ বৈরী রাষ্ট্র শক্তির অনুকূলে যাবে। এটা কাম্য নয়। রাষ্ট্রীয় সংহতি ইসলামের স্বার্থে হলে কাম্য। অন্যথায় রাষ্ট্র শক্তি অধিক বিপর্যয়ের জন্ম দেয়। সংক্ষেপে কথাগুলো বলে ইমাম হোসাইন আগে অগ্রসর হন।

পথিমধ্যে বিখ্যাত কবি ফরজদাকের সাথে 'সাফাহ' নামক স্থানে ইমামের সাক্ষাত হয়। ইমাম হোসাইন তাঁকে প্রশ্ন করেন ঃ بين لنا نبأ الناس خلفك তোমার পেছনের লোকজনের খবর আমাদের নিকট ব্যক্ত কর। ফারাজদাক কবি কূফা হতে আসছিলেন। তিনি বললেন ঃ من الخبير سألت জ্ঞাত ব্যক্তির কাছেই প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন।

قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى امية والقضاء ينزل من السماء والله يفعل مايشاء –

"লোকজনের অন্তর আপনার সাথে আছে। কিন্তু তাদের তরবারী বনু উমাইয়্যাদের সাথে। ফয়সালা আসমান হতে নাযিল হয়। আর আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন।"

কবি ফারাজদাকের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন বললেন ঃ

صدقت لله الامر والله يفعل مايشاء وكل يوم ربنا فى شأن – ان نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على اداء الشكر وان حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوى سريرته –

(الطبرى ج٥ ص٢١٨ س.٦ ٥)

"ঠিকই বলেছ। আল্লাহর হাতেই ব্যাপারটি। যা ইচ্ছা হয় তাই তিনি করেন।

নিত্য আমাদের প্রতিপালক নতুন অবস্থায় থাকেন। তাঁর ফায়সালা আমাদের আশানুরূপ হলে আমরা তাঁর অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রশংসায় প্রবৃত্ত হই। আর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য তাঁর নিকটই সাহায্য চাইতে হয়। আর যদি ফায়সালা আমাদের আশানুরূপ না হয় তাহলে সত্য ও ন্যায়ের উপর দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং খোদাভীতি যার অন্তরে প্রোথিত সে কোনই পরোয়া করে না।"[৩]

ইমাম হোসাইনের উল্লেখিত বাণীতে ইসলামী বিপ্লবের কর্মীদের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। সামনে পথ বন্ধ মনে হলেও সংগ্রামের ইতি টানতে নেই। কাজ চালিয়ে যেতেই হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর উদ্দেশ্য হল আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করে যাওয়া। ফলাফল চিন্তা করে কাজ করে দুনিয়াদার ব্যক্তিবর্গ। সেখানে লাভ লোকসানের প্রশ্ন থাকে। আর ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার কর্মী বাহিনীর উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর জন্য কাজ করে যাওয়া। এখানে লাভ-ই লাভ। লোকসানের কোন সম্ভাবনা নেই। আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ ধারনা নিয়ে মুজাহিদকে অগ্রসর হতে হয়। ঈমান ও প্রত্যয়ের বিশুধ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে। নিয়ত খারাপ থাকলে হিজরত করেও সাওয়াব পাওয়া যায় না। আর ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে তাকওয়া ও খোদাভীতি থাকতেই হবে। লোভ লালসা স্বার্থ চিন্তা বিমুক্ত খোদাভীতি পূর্ণ অন্তর না হলে ইসলামী আন্দোলনের সত্যিকারের কর্মী হওয়া যায় না। সবর ও শোকর মুজাহিদের পাথেয়। ইমাম হোসাইনের বাণীতে আমরা এরই সন্ধান পাই।

ইমাম হোসাইন জিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে মক্কা হতে বের হন। পথে কবি ফারাজদাকের সাথে দেখা হয়। সেদিনটি ছিল আরাফাতের ময়দানে হাজীদের অবস্থান করার দিন। কবি ফারাজদাক প্রশ্ন করেন ঃ

يا ابن رسول الله ما اعجلك عن الحج

"হে রাসূলের নাতি! হজ ছেড়ে জলদী চলে আসলেন কেন? উত্তরে ইমাম হোসাইন বললেন ঃ

فقال : لولم اعجل لاخذت (الطبرى ج٥ ص٢١٨ س.٦٠)

তাড়াতাড়ি চলে না আসলে আমাকে গ্রেফতার করে ফেলা হত।"[৪]

আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, হযরত ইমাম হোসাইন একাধিকবার হজ্জ করেছিলেন। তাঁর উপর হজ্জ করা ফরয ছিল না। এদিকে হজ্জ সমাপ্তির পর তাঁর এজিদের বরকান্দাজদের হাতে ধরা পড়ার আশংকা দেখা দেয়। তাই তিনি শুধু উমরা-হজ্জ পালন করে বেরিয়ে পড়েন। এতে বুঝা যায় এজিদের প্রেরিত পত্র মোতাবিক যে

কোন উপায়ে ইমাম হোসাইনকে গ্রেফতার করার প্রস্তুতি চলছিল। আর হিজাযে বসবাস করা ইমামের জন্য দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। প্রকৃত পক্ষে উমাইয়্যারা চাচ্ছিল আলে রাসূলের মধ্যে কেউ যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইমাম হাসান ক্ষমতা ত্যাগ করেন। কিন্তু তবু তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়া হল না। বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হল। মাওলানা থানবীর উদ্ধৃতিতে আমরা তা বলেছি। ক্ষমতার জন্য যারা মানুষ হত্যা করে তারা আর যাই হোক মানুষ হতে পারে না। ইমাম হোসাইন এবং আহলে বায়েত নবী পরিবারের সকলেই ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন। এ জন্যই ইসলামের খেলাফ কার্য সম্পাদনকারীরা সর্বদা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। আহলে বায়েত ইমামগণের ইতিহাস তাই বলে। হযরত নাফসে যাকিয়্যা, হযরত ইব্রাহীম, মুহাম্মদ, হযরত যাইদ প্রমুখ আহলে বাইত ইমামগণ বাতিলের বিরুদ্ধে নিজ নিজ সময়কালে উত্থান করেছেন এবং নিগৃহীত হয়েছেন। এভাবে তাঁরা শাতাদাতের পেয়ালা পান করে জালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর তালীম দিয়ে গেছেন। এটাই ছিল ইমাম হোসাইনের পথ।

মুসলিম ইবনু আকীলের শাহাদাত

ইমাম হোসাইনের সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখিয়েছেন হযরত মুসলিম ইবনু আকীল। তিনি এবং তাঁর পরিবারের লোকেরাই ইমাম হোসাইনের সাথে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ফলে ইমাম হোসাইনের সংগ্রামে সফলতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ইমাম হোসাইন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। হুট করে তিনি কূফার পথে পা বাড়াননি। কূফাবাসীরা বার বার পত্র লিখেছে। প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। জলসা করে করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়েছে। তখনও ইমাম হোসাইন (রাঃ) কূফা গমন করেননি। তাদের আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন। কূফার বিশ্বাস ঘাতকরা কিরূপ প্রস্তুতি নিয়েছিল ইমামের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য তা উল্লেখ করতে অনর্থক সময়ক্ষেপন করতে চাই না। কারণ কার্যতঃ তারা তা করেনি। ইমামের শত্রু পক্ষে যোগদান করে নবী পরিবারকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছে। ইমাম হোসাইনকে তাদের চোখের সমানে নিহত হতে দেখেছে। এক কদম অগ্রসর হয়েও তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে রক্ষা করতে আসেনি। অথচ এজিদ বাহিনীর অশ্ব সেনা প্রদান হুর ইবনু এজিদ অসময়ে হলেও প্রাণ পাত করে ইমাম হোসাইনের পক্ষে এসে এজিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করেছেন। যারা ইমামকে ডেকে এনেছিল তারা এজিদের বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। মানুষ কী বিচিত্র!

যাই হোক আমরা বলছিলাম ইমাম হোসাইন আনাড়ি বালকের ন্যায় উমাইয়্যাদের ভিমরুলের তাকে ঢিল ছুঁড়ে মারেননি। তিনি তাদের প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচার উৎখাত করার জন্য সম্ভাব্য সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। যার ফলে মুসলিম ইবনু আকীল ১৮ হাজার লড়াকু যোদ্ধা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন ইমাম হোসাইনের জন্য। প্রায় সকল কূফাবাসী বায়আত করেছিল তাঁর হাতে ইমাম হোসাইনের জন্য। এজিদের পক্ষের শাসনকর্তা নোমান ইবনু বশীর তাঁর রাজপ্রসাদে গৃহবন্দীর জীবন যাপনে বাধ্য হয়ে পড়েছিলেন। পথে ঘাটে ইমাম হোসাইনের আগমনের রব উঠেছিল লোকের মুখে মুখে। বিপ্লবের এ অনুকূল পরিবেশ দেখে হযরত মুসলিম ইবনু আকীল ইমাম হোসাইনকে কূফায় আসার জন্য লোক মারফত খবর দেন। পত্র লিখেন। ইমাম হোসাইন তখনই অতি সতর্কভাবে কূফার পথে পা বাড়ালেন। ইমাম হোসাইন ৮ জিলহজ্জ মক্কা হতে রওয়ানা হন। আর আড়াই মাস পর কারবালায় পৌছেন মহররম মাসে। এরও বহু আগে হযরত মুসলিম ইবনু আকীলকে তিনি প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্য কূফায় প্রেরণ করেছিলেন। আর আলোচনার মাধ্যমে ইমাম হাসানের ক্ষমতা ত্যাগের পর হতেই উমাইয়্যা স্বৈরাচার রুখার জন্য নবী পরিবারের লোকেরা তৎপর ছিলেন। জনাব আমীর মুআবিয়া (রাঃ)–এর ২০ বছর রাজত্বকালের শেষের দিকে এ তৎপরতা দানা বেধে উঠছিল। জনগণ তখন জনাব আমীর মুআবিয়ার মৃত্যুর জন্য দিন গুণছিল। এ পরিস্থিতিতেই জনাব আমীর মুআবিয়া তিন পাশে মখমলের মোটা বালিশ সাজিয়ে মুখমণ্ডলে তৈল মালিশ করিয়ে সুস্থ হওয়ার ভান করে বিশেষ মহলের তৎপরতা প্রতিহত করেছিলেন। আমাদের বলার উদ্দেশ্য হল, ইমাম হোসাইন একটি প্রতিষ্ঠিত জালিম সরকারকে উৎখাত করার জন্য যথা সম্ভব ব্যবস্থা নিয়েই ময়দানে নেমেছিলেন। অর্বাচীনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েননি।

বিগত বিশ্ব মহাসমরে মিত্রবাহিনীর প্রতিপক্ষের পরাজয় দেখে যদি বলা হয় যে, তারা কোনরূপ প্রস্তুতি না নিয়েই যুদ্ধে নেমেছিল তাহলে তা অবান্তর কথা হবে। মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে তদের যথাসাধ্য প্রস্তুতির পরও বিধিবাম ছিল। ফলে পরাজয় বরণ করতে হয়। ইমাম হোসাইনের জামানায় সংবাদ আদান প্রদানের জন্য বর্তমান সুযোগ সুবিধাদি মোটেই ছিল না। অথচ পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছিল। হযরত মুসলিম ইবনু আকীল উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের হাতে বন্দী হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। এ সংবাদ দেরীতে ইমাম হোসাইনের নিকট পৌঁছায়। তাও উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াযের সহচর উমর ইবনু সাদের সূত্রে পাঠানো ব্যক্তির মাধ্যমে। মুসলিম ইবনু আকীল শাহাদাত বরণের পূর্ব মুহূর্তে তাকে অসিয়ত করে যান যে, আমার শাহাদাতের খবর

ইমাম হোসাইনকে পৌছে দিয়ো। আর তাঁকে কূফায় আসতে নিষেধ করার কথা আমার পক্ষ হতে জানিয়ে দিয়ো। কারণ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।[৫]

হযরত মুসলিম ইবনু আকীল ধৃত হয়ে আহত অবস্থায় কাঁদতে থাকেন। এজিদের উপদেষ্টা আমর ইবনু ইবাইদ তাঁকে তিরস্কার করে বলে ঃ যারা এরূপ কর্মে বন্দী হয় তাদের চোখে পানি আসার কোন অর্থ হয় না। হযরত মুসলিম ইবনু আকীল বলেন ঃ আমি আমার দুরাবস্থার জন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি ইমাম হোসাইনের জন্য। তাঁর পরিবারের জন্য। তাঁরা কূফায় উপনীত হলে কি অবস্থার মুখোমুখি হবেন তা ভেবে আমার চোখে অশ্রু নেমে এসেছে।[৬]

মুসলিম ইবনু আকীলের নিহত হওয়ার সংবাদ

মুহাম্মদ ইবনু আশআছের প্রেরিত লোক এসে ইমাম হোসাইনকে নির্মমভাবে মুসলিম ইবনু আকীলের নিহত হওয়ার সংবাদ পৌছায়। এ সংবাদ পেয়ে ইমাম হোসাইন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন পাঠ করেন এবং বলেন ঃ

كل ماقدر نازل عند الله نحتسب انفسنا وفساد امتنا -

(كامل ابن اثير ص١٤ ج٤)

"যা ভাগ্যে আছে তা ঘটবেই। আমাদের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রাখি। আর আমাদের দলের বিপর্যয়ে তাঁরই নিকট সবর করি।"[৫]

ইমাম হোসাইন ধৈর্যের পাহাড় ছিলেন। প্রাণের চাচাতো ভাই ও নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধির নির্মম হত্যার খবর পেয়েও তিনি এতটুকু বিচলিত হননি। তাকদীরের লিখন অব্যর্থ বলে তিনি উক্তি করেন। সমর্থকদের বিশ্বাস ঘাতকতার দরুন সৃষ্ট কষ্ট ভোগ ও হত্যা কাণ্ডের জন্য আল্লাহর নিকট বিনিময় চান। প্রকৃতপক্ষে বিজয় লাভের জন্য সংগ্রাম করা এবং পরাজয়ের পর ধৈর্য ধারণ করাও পরকালে সাওয়াবের আশা পোষণ করার মাধ্যমে চূড়ান্ত প্রাপ্য হাসিল করা একজন নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদের পরম প্রাপ্য। শহীদ মুজাহিদই তা পেয়ে থাকেন। হযরত মুসলিম ইবনু আকীল আল্লাহর পথে প্রাণদান করে সে রূপ পূণ্যের অধিকারী হন।

ইবনু যিয়াদের সামনে মুসলিম ইবনু আকীলের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা

ধৃত হয়ে হযরত মুসলিম ইবনু আকীল ইবনু যিযাদের নিকট নীত হন। ইবনু যিয়াদ কেন বিদ্রোহ করেছেন তার কারণ জানতে চায়। নির্ভীর মুসলিম ইবনু আকীল উত্তরে যা বলেছিলেন তা আমরা মুফতী মরহুম মোহাম্মদ শফী সাহেবের ভাষায় পরিবেশন করলামঃ

مسلم بن عقیل رضہ نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگون نے خطوط لکھے کہ تمہارے باپنے ان کے نیک اورشریف لوگون کو قتل کردیا ان کے خون ناحق بہائے اور یہان کے عوام پر کسری وقیصر جیسی حکومت کرنی چاھی، اس لیئے ھم اس پر مجبورھوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب وسنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگون کو بلائین اور سمجھائین - (شسہید کر بلا ص٤٥)

"মুসলিম ইবনু আকীল (রাঃ) বললেন ঃ এই কূফা নগরের লোকেরা পত্র লিখে বলেছে যে, তোমার বাপ (যিয়াদ) তাদের সৎ ও পূণ্যবান লোকদেরকে হত্যা করে। অন্যায়ভাবে তাদের রক্তপাত ঘটায়। আর এখানকার জনগণের উপর কিসরাও ফায়সার তথা রোমের বাদশাহ ও ইরানের সম্রাটের ন্যায় রাজত্ব করতে থাকে। এ জন্য আমরা (আহলে বাইতগণ) ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ বলবৎ করার জন্য লোকদেরকে ডেকেছি এবং বুঝিয়েছি।"[৬] অর্থাৎ ঃ উত্থান প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করার কারণ ব্যাখ্যা করে হযরত মুসলিম ইবনু আকীল ইবনু যিয়াদকে প্রথমেই বলেন যে, তার পিতা যিয়াদ এখানে শাসনকর্তা থাকার সময় না হক রক্তপাত করে। সৎ ও নেক্কার লোকজনকে হত্যা করে। (সম্ভবতঃ হুজুর ইবনু আদী (রাযি) এবং তাঁর ন্যায় নিহত অন্যান্যের প্রতি ইঙ্গিত ছিল) জুলুম-নির্যাতন চালায়। রোমান পারস্য রাজাদের ন্যায় রাষ্ট্র পরিচালনা করার চেষ্টা করে। কুরআন ও হাদীসের বিধান লংঘন করে। এমতাবস্থায় আদলও ইনসাফ কায়েম এবং কুরআন ও সুন্নার নির্দেশ বলবৎ করার জন্য

আমরা আহলে বাইতগণ অগ্রসর হয়েছি। ইবনু যিয়াদ কুরআন ও সুন্নার কথা শুনে এবং তার নিজের পিতার জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কারণ হল কুরআন ও সুন্নাহ ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আহবান জানায়, যা স্বৈরাচারী ইবনু যিয়াদের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। সে হযরত মুসলিম ইবনু আকীলকে হত্যা করার হুকুম জারি করে। মুসলিম ইবনু আকীল শহীদ হয়ে যান। হযরত ইমাম হোসাইনের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হযরত মুসলিম ইবনু আকীলের ভাষণেও ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে মুফতী মুহাম্মদ শফী (রাঃ)—এর বক্তব্য

পূর্বে আমরা ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছি। আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রাঃ) সুন্দরভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে তা তুলে ধরলাম ঃ

واقعہ شہادت کو اول سے آخر تک دیکھئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خطوط اور خطبات کو غورسے پڑھئے آپ کو معلوم ہوگا کہ مقصود یہ تھا :-

(۱) کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا -

(۲) اسلام کے نظام عدل کو ازسرنو قائم کرنا -

(۳) اسلام مین خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت وآمریت کی بدعت کے مقابلہ مین مسلسل جہاد کرنا -

(٤) حق کے مقابلہ مین زور زرکی نمائشون سے مرعوب نہ ہونا -

(٥) حق کے لیئے اپنا جان ومال اور اولاد سب قربان کردینا -

(٦)خوف وهراس اور مصيبت مين نه گهبرانا اور هروقت الله تعالى كويادركهنا اور اسى پرتوكل اور هرحال مين الله تعالے كا شكر اداكرنا - (شهيد كربلا ٧)

"ইমাম হোসাইনের শহীদ হওয়ার বিষয়টি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করে যান। হযরত ইমাম হোসাইনের পত্রাদি ও ভাষণগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করুন। আপনি জানতে পারবেন এর উদ্দেশ্য ছিল ঃ

(১) কুরআন ও সুন্নাহর আইন যথাযথভাবে প্রচলিত করা।

(২) পুনরায় ইসলামের ইনসাফ কায়েম করা।

(৩) ইসলামে নবুওয়াত পদ্ধতির খেলাফত–এর স্থলে রাজতন্ত্র ও স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার বিদআত ঠেকানোর জন্য একাধারে 'জিহাদ' পরিচালনা অব্যাহত রাখা।

(৪) ন্যায়ের মুকাবিলায় অর্থ–শক্তির প্রদর্শনী দেখে ভীত না হওয়া।

(৫) ন্যায়ের সংগ্রামে নিজেকে জান–মাল সন্তানাদি সব কিছু কুরবান করে দেয়া।

(৬) ভয়–ভীতি ও বিপদে বিচলিত না হওয়া। আর সকল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা এবং একমাত্র তাঁর প্রতি ভরসা রাখা। সব শেষে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার শোকর গুজারী করা।"

হযরতুল উস্তাদ মরহুম মুফতী মুহাম্মদ শফী (রাঃ) ছিলেন অত্র উপমহাদেশের বিশিষ্ট ফিকাহবিদ সচেতন আলেম এবং অত্যন্ত পরহেজগার ব্যক্তি। এ কথাগুলো তাঁর ও তাঁর মাদ্রাসার অন্যান্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর ছাত্র হিসাবে বলছি না। তাঁকে যাঁরা দেখেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে যাঁরা জানেন তাঁরা আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত হবেন। তিনি ইমাম হোসাইনের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন। ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য নিপূণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর সংগ্রামী জীবনের তিনি যে নির্যাস তুলে ধরেছেন তা অতুলনীয়।

১ম অংশে তিনি কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আইন প্রবর্তনের লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সঠিকভাবে তাজারি ছিল না বলেই তা কায়েমের জন্য ইমাম সংগ্রাম করেন।

২য় অংশে তিনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, মানে তা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যার জন্য ইমাম হোসাইনকে সংগ্রামে নামতে হয়েছিল।

৩য় অংশে নবুওয়াত পদ্ধতির খিলাফত প্রতিষ্ঠার স্থলে উমাইয়্যা যুগে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে, এ তৎপরতার বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে 'জিহাদ করে যাওয়া ইমাম হোসাইনের লক্ষ্য ছিল। বলাবাহুল্য, এরূপ অপপ্রয়াস খোদ জনাব আমীর মুআবিয়া (রাঃ) শুরু করেন।

৪র্থ অংশে তিনি অর্থ উৎকোচের ছড়াছড়ি দেখে ভীত না হয়ে ন্যায়ের পথে সংগ্রামে গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

৫ম অংশে ন্যায়ের পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে জান-মালের কুরবানী এমনকি সন্তানাদি কুরবান করে দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

৬ষ্ঠ অংশে বিপদে ধৈর্যধারন আল্লাহকে সর্বদা মনে স্মরণ করাও শোকর গুজারী করার লক্ষ্যও উল্লেখ করেছেন। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণে রাখার তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহর পথের মুজাহিদই অনুধাবন করে থাকেন। হযরত উস্তাদ মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ শফী সাহেব (রাঃ) যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করেছেন তা দেখে বলতে হয় যে, বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল বলে ইমাম হোসাইন এ লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। উক্ত বিশেষ পরিস্থিতি মাত্র এজিদের সিংহাসন আরোহনের সাথে সাথেই আত্মপ্রকাশ করেনি। জনাব আমীর মুআবিয়ার যুগে তার সূচনা হয় এবং শীঘ্রই পরিপক্কতা লাভ করে। তার চরম রূপ এজিদের হাতে প্রকাশ পায়। এজিদের যুগে ইমাম হোসেনের শাহাদাত এবং জনাব আমীর মুআবিয়ার আমলে হুজুর ইবনু আদীর ন্যায় ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিবর্গের জীবন নাশকে সম পর্যায়ে রাখা না গেলেও কাছাকাছি রাখা যায়। আর মুআবিয়া আমলে যিয়াদের হত্যাযজ্ঞ এক সাথে যুক্ত করা হলে বাপ-বেটার আমল সমান হয়ে যায়। ফারাক থাকে কেবল একজন সাহাবী এবং অন্যজন সাহাবী নয়।

সূত্র সূচী ঃ

১· তাবারী ঃ ৫ম খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা।
২· ইউনূস ঃ ৪১ আয়াত।
৩· তাবারী ঃ ৫ম খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা।
৪· ঐ ঃ ঐ ২১৮ ঐ
৫· ইবনু আসীর ঃ ৪র্থ খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।
৬· শহীদে কারবালা ঃ ৪৫ পৃষ্ঠা।
৭· শহীদে কারবালা ঃ ৭ পৃষ্ঠা।

এজিদের দ্বারা ইসলামী খেলাফত রাজতন্ত্রে পরিণত হয়

درزمان امام حسین عمده این بودکه مدار خلافت اسلامی تبدیل سلطنت جائرانه ظالمانه و منحرفانه وفاسقانه عربی شده بودو نفاقها ازپرده درافتاده بود -

(مرتضی مطهر)

ইমাম হোসাইনের জামানায় সবচেয়ে বড় বিচ্যুতি এটাই ছিল যে, ইসলামী খেলাফত রূপ পরিগ্রহ করে বিভ্রান্ত জালিম ভোগবাদী পাপাচারী আরবীয় রাজতন্ত্রে পরিনত হয়।

—মুর্তাযা মুতাহহারী

(حماسة حسینی ج۳ ص۸۹)

খেলাফতে রাশেদা হতে বিচ্যুতি

আমরা পুর্বে বলে এসেছি যে, হযরত আমীর মুআবিয়া খলিফা রাশেদ ছিলেন না। এমনকি শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (রাঃ)–এর মতে খলীফা নামে বিভুষিত হওয়ার যোগ্য তিনি ছিলেন না, যদি ও পরোক্ষ অর্থে তাকে খলীফা বলাহত। এখানে আমরা এর মূল কোথায় তা বর্ণণা করব। হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার পুস্তিকা শহীদে কারবালাতে–

(اجتماعی طورپر معاویہ رضہ کو صحیح مشورہ)

"সংগবদ্ধভাবে মুয়াবিয়াকে (রাঃ) সঠিক পরামর্শ" শিরোনামে মুয়াবিয়া পুর্ব যুগের নীতির কথা উল্লেখ করেন। যা আমীর মুআবিয়া মেনে চলেন নি। উস্তাজ মুহতারাম মুফতী শফী সাহেব লেখেন ঃ

اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضہ او عبد اللہ ابن زبیر وغیرہ خود جاکر حضرت معاویہ رضہ سے ملے، اور ان سے کہا کہ آپ کے لیئے یہ کسی طرح مناسب نہین ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیئے بیعت پر اصرار کرین، ہم آپ کے سامنے تین صورتین رکھتے ہین جو آپ کے پشتروٗن کی سنت ہے -

(۱) آپ وہ کام کرین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےکیاکہ اپنے بعد کے لیئے کسی کو متعین نہین فرمایا بلکہ مسلمانون کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا -

(۲) یا وہ کام کرین جو ابو بکر رضہ نے کیا کہ ایك ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے، نہ ان کا کوئی قریبی شتہ دارہے اور اس کی اہلیت پربھی سب مسلمان متفق ہین -

(۳) یا وہ صورت اختیار کرین جو حضرت عمر رضہ نے کی

کہ اپنے بعدکا معاملہ چھے آدمیون پر دائر کردیا -
اس کے سواھم کوئی چوتھی صورت نہین سمجھتے نہ قبول
کرنے کے لیئے تیار ھین - (شھید کر بلا ١٦)

অতপর হযরত হোসাইন ইবনে আলী (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর প্রমুখ স্বতস্ফূর্তভাবে আমীর মুআবিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাকে বলেন ঃ আপনি আপনার ছেলের জন্য বায়আত নিতে বদ্ধ পরিকর এটা আপনার জন্য শোভনীয় নয়। আমরা আপনার সামনে তিনটি পদ্ধতি উপস্থাপন করছি যা আপনার পুর্বের লোকদের বরণীয় নীতি ছিল।

(১) আপনি সে কাজ করুন ; যেকাজ রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে গেছেন। তিনি তাঁর পর নির্দিষ্টভাবে কাউকে স্থালাভিষিক্ত করে যাননি।

(২) অথবা সে কাজ করুন, যা আবু বাকর (রাঃ) করেছেন। তিনি এমন এক ব্যক্তির নাম উপস্থাপন করেছেন, যিনি তার গোত্রের ছিলেন না। তার নিকট আত্নীয় ও ছিলেন না। আর তাঁর যোগ্যতার প্রতি সকলের আস্থা ছিল।

(৩) অথবা সে পন্থা অবলম্বন করুন ঃ যা হযরত উমর অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর উত্তরকালের সমস্যা সমাধানের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী রেখে যান।

এ ছাড়া আমরা চর্তুথ কোন উপায় দেখি না। চর্তুথ কোন পন্থা আমরা মেনেও নেবনা।"[১]

ন্যায় নীতির দিক দিয়ে প্রস্তাব তিনটি যুক্তি সংগত। সবচেয়ে উত্তম পথ হল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ যা প্রথম অংশে ইল্লেখ করা হয়েছে। খলীফারা নিজ নিজ যামানার ব্যাপারে সাওয়ালের জবাব দিতেই পেরেশান থাকবেন। পরবর্তী যামানার দায়িত্ব নেয়ার দুঃসাহস করা অবান্তর। তবু যদি কেউ অনুরুদ্ধ হয়ে তা করতে যায় তাহলে পারিবারিক গোত্রীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে তা করা উচিত, যা হযরত মুআবিয়াী করতে পারেননি। আমীর মুআবিয়া (রাঃ) তার সন্তানকে খলীফা পদে বসিয়ে খোলাফায়ে রাশেদ গনের নীতি লংঘন করেছেন। ইসলামী খেলাফতের নবুওয়াতী ধারার পরিপন্থী কাজ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সুন্নত অবলম্বন করো এবং আমার পর খলীফা রাশেদীনের সুন্নত অবলম্বন করো।[২] আমীরে মুআবিয়া এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। ফলে তিনি খেলাফতের নীতি বিচ্যুত হয়ে পড়েন। এই বিচ্যুতি থেকে সমগ্র মিল্লাতকে সঠিক পথে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ইমাম হোসাইন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। শাহাদাত বরণ করেন।

সূত্র সূচী ঃ

১· তাবারী ঃ ৫ম খণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠা ৬০ হিজরী সাল ।
২· ইউনুস ঃ ৪১ আয়াত,
৩· তাবারী ঃ ৫ম খণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠা ৬০ হিজরী সাল ।
৪· ঐ ঃ ঐ ২১৮ ঐ
৫· শহীদে কারবালা ঃ প্রণীত ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী ৪৪ পৃষ্ঠা ।
৬· ঐ ঐ ঃ ঐ ঐ ৪২ পৃষ্ঠা ।
৭· ঐ ঐ ঃ ঐ ঐ ৪৫ পৃষ্ঠা
৮· ঐ ঐ ঃ ঐ ঐ ১৬ পৃষ্ঠা
৯·
১০· মিশকাত ঃ জামিউল মানাকিব ঃ ৫৮৩ পৃষ্ঠা, টীকা নং-৩
১১· ঐ ঃ টীকা নং-৩ বরাতে মিরকাত ও লুমুআত।

তিরমাহ ইবনু আদীর প্রস্তাব

আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে তাই' গোত্র বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা তাই-অধ্যুষিত আজা ও সালামা পাহাড় অঞ্চলে বাস করতেন। যোদ্ধা জাতি হিসেবে তাঁদের খ্যাতি ছিল। তিরমাহ্ ইবনু আদী তাইগোত্রের বিশিষ্ট নেতা। তিনি ইমাম হোসাইনকে তাঁর সাথে আজা ও সালামা পাহাড়ে আশ্রয়নেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেনঃ "আমি দেখ্তে পাচ্ছি, আপনার সাথে সমর শক্তি এবং সৈন্য-বল কিছুই নেই। আপনার সাথে লড়াই করার জন্য হুর ইবনু এজিদের বর্তমান সেনা-শক্তি ছাড়া যদি আর কেউ সাহায্য করতে না আসে তবু আপনি তাকে পরাস্ত করতে পারবেননা। আর আমি কুফা থেকে চলে আসার সময় বিরাট সেনা সমাবেশ লক্ষ্য করে এসেছি। তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হয়ে আসছে। এতোবড় সেনাবাহিনী পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, তাদের দিকে আপনি অর্ধহাতও অগ্রসর হবেননা। অপনি আমার সাথে চলুন। আমি আপনাকে আমার অবস্থান-আজা-পাহাড়ে রাখব। পাহাড়টি একটি দুর্ভেদ্য দূর্গের ন্যায়। আমরা গাস্সান রাজন্যবর্গ, হিম্য়ার রাজবংশ ও লোকমান ইবুনে মুনযিরের মুকাবিলা করেছি ওখানে আশ্রয় নিয়ে। এসব মোকাবিলায় আমরা কৃতকার্য হয়েছি। আপনি সেখানে গমন করে অবস্থান নিন। অতঃপর আজা ও সালামা পাহাড়দুটিতে বসবাসরত তাই গোত্রের লোকদেরকে ডেকেনিন। আল্লাহর কসম, দশদিন অতিবাহিত নাহতেই তারা হেঁটে ও বাহনে আরোহণ করে আপনার নিকট হাযির হয়ে যাবে। আপনার সাহায্য করবে। তখন আপনি যদি যুদ্ধ করতেই চান তাহলে আমি আপনার জন্য বিশ হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করে দেব। তারা আপনার চোখের সামনে বীরের মতো লড়বে। তাদের একজনও বেঁচে থাকতে কেউ আপনাকে স্পর্শ করার সাহস পাবে না।

এ প্রস্তাবের জবাবে ইমাম হোসাইন বলেনঃ হুর ইবনু এজিদের সাথে তাঁর কথা হয়েছে যে, সে তার উর্দ্ধতন কর্তাদের নির্দেশ আশার অপেক্ষা করবে। আক্রমণ করবেনা। আমিও কোথাও পালাবনা। আমি এ ওয়াদা খেলাফ করতে পারিনা। তোমাকে ধন্যবাদ।"[২]

বলা বাহুল্য নবীবংশের কেউ ওয়াদা খেলাফ করতে পারেননা। এযে কুরআনের নির্দেশ।[৩] আর চেষ্টা করলেও সে সময় হুর ইবনু এজিদের সেনাবাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করা সম্ভব হতনা। ওয়াদাবদ্ধ হওয়ার আগে ইমাম হোসাইন মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্য সাথীদেরকে হুকুম দেন। কিন্তু হুর ইবনু এজিদ এতে বাধা দেয়। তার বাহিনীর সাথে ইমাম হোসাইনের সাথীরা কুলিয়ে উঠতে পারেনি। কাজেই তাই-পাহাড়ে

পৌঁছার কোন উপায় ছিলনা। আর কুফাবাসীরাও তো আল্লাহর নামে শপথ করে ইমামকে ডেকেছিল। পরে প্রলোভনে পড়ে ও এজিদের ভয়ে সবকিছু ভুলে যায়। তাইরাযে ব্যতিক্রম হবে তারই বা কি নিশ্চয়তা ছিল। তিরমাহ ইমামকে বলে যান অচিরেই তিনি অস্ত্রনিয়ে ফিরে আসবেন। এসেও ছিলেন। পথিমধ্যে খবর পেলেন যে ইমাম হোসাইন কারবালায় শহীদ হয়েছেন। আর জীবিত নেই। কিন্তু ইতিহাস নিরব। তিনি তো বিশ হাজার যোদ্ধা দেয়ার কথা বলেছিলেন। তার সাথে কজন এসেছিল ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই।

ইমাম সাথীদেরকে ফিরে যেতে বলেন

যুবালা নামক স্থানে পৌঁছলে ইমাম হোসাইন মুসলিম ইবনু আকীলের নিহত হওয়ার খবর পান। তখন তাঁর প্রত্যয় জন্মায় যে পরিস্থিতি প্রতিকূলে। সামনে বিপদ। তাই যারা সাথে আছে তাদেরকে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা উচিৎ। তারাযেন চলে যায়। ইমাম হোসাইনের ইরাক যাওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর বহু লোক তাঁর সাহচার্যে গমন করে। পরিস্থিতি প্রতিকূলে দেখে তারা পথিমধ্যেই কেটে পড়ে। ইমাম হোসাইন তখন যে ভাষণদেন তাতে তিনি বলেনঃ

بسم الله الرحمن الرحيم : اما بعد فانه قد اتانا خبر فظيع قتل مسلم بن عقيل وهانى بن عروة وعبد الله بن بقطر وقد خذلتنا شيعتنا- فمن احب منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام - (الطبرى ج٥ ص٢٢٦ س.٢)

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, অতঃপর অবগত হও। আমাদের নিকট মুসলিম ইবনু আকীল, হানী ইবনু উরওয়া, আব্দুল্লাহ ইবনু বক্তার প্রমুখের নিহত হওয়ার ভীতিপ্রদ খবর এসেছে। আমাদের দলের লোকেরা আমাদের সাহায্য করেনি। এমতাবস্থায় তোমরা যারা ফিরে চলে যেতে চাও তারা ফিরে যেতে পার। আমাদের পক্ষ হতে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নেই।"[৪]

মুসলিম ইবনু আকীল ইমামের প্রতিনিধি ছিলেন। হানী ইবনু উরওয়ার বাড়ীতে থেকে তিনি ইমাম হোসাইনের পক্ষে লোকজনের বায়আত নিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু

বাক্তার ইমাম হোসাইনের দুধ শরীক ভাই ছিলেন। তিনি ইমাম হোসাইনের আগমন বার্তা নিয়ে এবং বাছরাবাসীদেরকে সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্য ইমামের আহবানের পত্র নিয়ে বাছরায় যান। কাদিসিয়া নামক স্থানে উমর ইবনু সাআদের লোকেরাতাকে গ্রেফতার করে উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের কাছে প্রেরণ করে। উবায়দুল্লা তাঁকে হত্যা করে। তার মানে হল খবরা খবর আদান প্রদানের পথও নিরাপদ ছিল না। আর গন্তব্যস্থান কুফার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। ইমাম হোসাইনের পক্ষের লোক যারা ছিল তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। হানি ইবনু উরওয়ার ন্যায় প্রভাবশালী নেতা প্রাণ হারালেন। কাজেই কোন দিকেই আশার আলো দেখা যাচ্ছিল না।

এমতাবস্থায় সাধারণ সমর্থকদেরকে অন্ধকারে রেখে বিপদে ফেলা ইমাম শ্রেয় মনে করেননি। তাই সবাইকে চলে যেতে বলেদেন। লোকজনও চলে যায়। যারা মদীনা হতে ইমামের সাথে এসেছিলেন এক্ষেত্রে তাঁরাই রয়ে গেলেন। ইমাম হোসাইন স্বার্থের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হননি। নিজের স্বার্থে লোকদেরকে বিপদাপন্ন করার পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। এখনকি করা যায় এবিষয়ে ইমাম সাথীদের সাথে পরামর্শ করেন। অবশিষ্ট সাথী তখন মাত্র ৭০ জন। ইমাম মুসলিম ইবনু আকীলের ছেলেদেরকে বললেনঃ আমার জন্য তোমাদের পিতার ত্যাগই যথেষ্ট। তোমরাও চলে যাও। তোমাদের বিপদগ্রস্ত করতে চাইনা। ইবনু আকীলের ছেলেরা বললঃ পিতার রক্তের বদলা না নিয়ে আমরা যাচ্ছিনা। লোকেরা বলাবলি করবে আমরা আমাদের খান্দানের সরদারকে অসহায় রেখে চলে এসেছি। রক্তদিয়ে রক্তের বদলা নেব। ইমাম হোসাইন ইবনু আকীলের সন্তানদের ভাবাবেগ দেখে মর্মাহত হলেন। বল্লেনঃ তোমাদের ছাড়া জীবিত থেকে লাভনেই। এভাবে তিনি নিশ্চিত মউতের দিকে এগিয়ে চললেন।

ইমামের প্রথম ভাষণ

সামনে অগ্রসর হয়ে এজিদের সেনাদলের মুখমুখি হলেন ইমাম। হুর ইবনু এজিদের নেতৃত্বে একহাজার অশ্বারোহী সেনা ইমাম হোসাইনকে পথ আগলে দাঁড়ালো। ইমাম তাদের মতলব জানতে চাইলেন। হুর বললঃ ইবনু যিয়াদ তাকে পাঠিয়েছে। তার কাজ হল ইমাম হোসাইনকে পথ আগলে আটকে রাখা। তার প্রতিযুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। ইমাম হোসাইন হুর ইবনু এজিদের লোকজনকে পানি পান করালেন। ইমাম হোসাইনের লোকেরা হুর ইবনু এজিদের সেনাদের অশ্ব গুলোকে

পানি পান করাল। ততক্ষণে যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হুর ইবন এজিদের লোকেরা ইমামের লোকজনের সাথে মিলেমিশে রইল। ইমাম অজু করে আসলেন। আর নামাযের পূর্বে একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে তাঁর আগমনের পটভূমি বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ

ايها الناس ! انها معذرة الى الله عز وجل واليكم انى لم آتكم حتى اتتنى كتبكم وقدمت على رسلكم ان اقدم علينا فانه ليس لنا امام لعل الله يجمعنابك على الهدى فان كنتم على ذالك فقد جئتكم فان تعطونى ما اطمئن اليه من عهودكم ومواثيقكم اقوم مصركم وان لم تفعلوا وكنتم لمقدمى كارهين انصرفت عنكم الى المكان الذى اقبلت منه اليكم -

قال (الراوى) فسكتوا عنه وقالوا للمؤذن اقم فاقام الصلواة - فقال الحسين عليه السلام للحر اتريد ان تصلى باصحابك ؟ قال لابل تصلى انت ونصلى بصلواتك قال فصلى بهم الحسين - (الطبرى ج٥ ص٢٢٨ س٢١ه)

-"হে জনমণ্ডলী। আমি আল্লাহর নিকট এবং তোমাদের নিকটও আমার আগমনের কারণ বর্ণনা করতে চাই। অহেতুক আমি তোমাদের নিকট আগমন করিনি। তোমাদের পত্রাদি এবং তোমাদের প্রতিনিধিবর্গ আমার নিকট আসার ফলেই আমি এখানে এসেছি। তারা বলেছে ঃ আপনি আমাদের নিকট চলে আসুন। আমাদের কোন ইমাম নেই। হয়তো আপনার মাধ্যমেই আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়াতের পথে একত্র করবেন। তোমরা যদি এ কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকো, তাহলে এইতো আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছি। এখন তোমরা যদি আমাকে তা প্রদান কর যা দ্বারা আমি আশ্বস্ত হতে পারি অর্থাৎ তোমরা যদি তোমারে ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞাগুলো পালন কর তাহলে আমি তোমাদের নগরে অবস্থান করব। যদি তানা কর, আমার আগমনে তোমরা যদি অসুখী হয়ে থাক তাহলে আমি যেখান থেকে তোমাদের নিকট

আগমন করেছি সেখানে ফিরে যাব।

বর্ণনাকারী বলেছেন, ইমামের বক্তব্যশুনে সকলেই চুপ রইল। কেহই উত্তর দিলনা। আর তারা মুআজ্জিনকে নামাযের জন্য ইকামত বলতে বলল। তখন ইমাম হোসাইনঃ হুর ইবনু এজিদকে বললেন তুমিকি তোমার সাথীদের ইমামতি করবে? হুর বললেনঃ না বরং আপনি নামায পড়ান। আমরা আপনার পেছনে নামায পড়ব। বর্ণনাকারী বলেনঃ তখন ইমাম হোসাইন নামাযে ইমাম হন এবং নামায পড়ান।"[৫]

ইমাম হোসাইন এভাষণে তাঁর আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাদের পত্র প্রেরণ ও তাদের প্রতিনিধিদের ইমাম সকাশে পৌছার পরই তিনি এ সফরে বের হন। উপযাচক হয়ে বা গায়ে পড়ে তিনি তাদের নিকট আসেননি। তারপরও তিনি বলেনঃ তাঁর আগমনে তারা বিব্রত বোধ করলে, অসুখী হয়ে থাকলে তিনি তাদের নগরে উঠবেন না। ফিরে চলে যাবেন। এরূপ প্রস্তাবের পরও তারা ইমামের পেছন ছাড়তে রাযী হয়নি। কি অশ্চর্য্য? বিষয়টি ভূয়া ছিলনা বলে তারা কোন উত্তর দিলনা। তবে তারা বলতে পারতোযে আপনাকে ডেকেছিলাম ঠিকই তবে এখন আর কথা রাখতে পারছিনা। পরিস্থিতি বদলেগেছে। আপনি চলে যান। কিন্তু তাদের সামনে একথা বলার উপায় ছিলনা। তাহলে ইবনু যিয়াদ তাদেরকে আর জ্যান্ত রাখতনা। স্বৈরাচার এজিদ বলপূর্বক ইমামের নিকট থেকে বায়আত আদায় করতে বদ্ধ পরিকর ছিল। মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তার নিকট এজিদের পাঠানো নির্দেশে একথা ছিল। ইবনু যিয়াদও নগদ বায়আত নেয়া ছাড়া কোনকিছুতে ছাড় দিচ্ছিল না। বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় ভাষণ

সেদিনই আসরের নামাযের পর দ্বিতীয় বার ইমাম হোসাইন কুফা হতে আগত হুর ইবনু এজিদের সেনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেনঃ

اما بعد ايها الناس ! فانكم ان تتقوا وتعرفوا الحق لاهله يكن رضى الله ونحن اهل البيت اولى بولاية هذا الامر عليكم من هؤلاء المدعين ماليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان -

وان كنتم كرهتمونا وجهلتم حقنا وكان رأيكم على غير ما اتتنى كتبكم وقدمت به على رسلكم انصرفت عنكم - فقال له الحرين يزيد انا والله ماندرى ما هذه الكتب التى تذكر -

فقال الحسين ياعقبة بن سمعان اخرج الخرجين الذين فيهما كتبهم الى - فاخرج خرجين مملوئين صحفا فنشرها بين ايديهم -

فقال الحرفانا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا اليك - وقد امرنا اذا نحن لقينا ان لانفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد- فقال له الحسين : الموت ادنى اليك من ذالك -

(الطبرى ج٥ ص٢٢٨ س.٢٠)

-"অতপরঃ হে লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহর ভয়ে ভীত হও এবং হকদারের জন্য তার হক অনুধাবন করো তাহলে তাতেই আল্লাহ রাযী হবেন। আর আমরা হলাম নবীর পরিবারের লোক আহলেবাইত। আমরাই তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করার অগ্রাধিকার রাখি তাদের তুলনায় যারা এ অধিকারের অযথা দাবীদার এবং তোমাদের উপর জুলুম চালায় ও সীমালংঘন করে।

যদি তোমরা আমাদেরকে অপসন্দকর আমাদের হক ভুলে গিয়ে থাকো এবং তোমাদের অভিমত পাল্টে গিয়ে থাকে, যা নিয়ে আমার নিকট তোমাদের পত্রাদি পৌঁছেছে। তোমাদের প্রতিনিধিরা এসেছে। তাহলে আমি ফিরে যাব। তখন তাঁকে হুর ইবন এজিদ বললেনঃ আল্লাহর কসম করে বলি আপনি যেসব পত্রাদির কথা বলছেন আমরা তা কিছুই জানিনা।

তখন ইমাম হোসাইন তাঁর একান্ত সচিব উক্‌বা ইবনু সামআনকে ডাকলেন।

আর বললেনঃ ওই থলে দুটি নিয়ে এসো, যাতে ওদের পত্রাদি রয়েছে। তখন তিনি দুটি থলে বের করলেন, যা চিঠিপত্রে ভরা ছিল। সেগুলি তিনি হুর ইবনে এজিদের লোকজনের সামনে ছড়িয়ে দিলেন।

হুর বললেনঃ এসবপত্র যারা লিখেছে আমরা তাদের মধ্যে নই। আমাদের হুকুম করা হয়েছে যখন আপনার দেখা পাই এখন থেকে আমরা যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে আপনাকে অনুসরণ করি। শেষাবধি আপনাকে ইবনু যিয়াদের নিকট পৌছে দেই। এ কথাশুনে হোসাইন তাঁকে বললেনঃ এর চেয়ে মৃত্যু অনেক সহজ।"[৬]

অতপরঃ ইমাম হোসাইন তাঁর সফর সাথীদেরকে হুকুম দিলেন তোমরা উঠ। বাহনে আরোহণ কর। তারা বাহনে আরোহণ করল। এবং মহিলাদের আরোহণ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। অতপরঃ ইমাম ফিরে চলার জন্য নির্দেশ দিলেন। সবাই যখন পথে নেমে পড়লো তখন হুর ইবনু এজিদের লোকেরা এসে বাধা দিল। ইমাম হোসাইন হুরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তোমার মা তোমাকে হারিয়ে তোমার জন্য কাঁদুক! তোমার মতলবকী? হুর বললেনঃ আরবের অন্য যে কেউ আমাকে আমার মার প্রসঙ্গ তুলে কথা বললে আমি তার মাকে তুলে কথা বলতে কুণ্ঠিত হতাম না। কিন্তু আপনার মার কথা বলার উপায় নেই। এরিমধ্যে উভয় পক্ষের লোকজনের মধ্যে বাক্য বিনিময় হতে থাকে। অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, হুর ইমাম হোসাইনকে ধরে উবায়দুল্লাহর নিকট নিয়ে যাবেনা। আর ইমাম মকক্কার দিকে ফিরে যেতেও পারবেন না। অন্যদিকে চলতে থাকবেন। এরি ফাঁকে ইবনু যিয়াদের সাথে পত্রালাপ চলতে থাকবে। হুর ইবনু এজিদের সেনারা ইমাম হোসাইনের কাফেলার সাথে সাথে চলতে থাকে। এভাবে তারা বায়যা নামক স্থানে পৌছে যায়। ইমাম হোসাইন সেখানে তৃতীয়বারের মতো তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। আমরা পূর্বে উক্ত ভাষণের উল্লেখ করে এসেছি। উক্ত ভাষণে ইমাম হোসাইন তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর উমাইয়্যাদের কুরআন সুন্নাবিরোধী আচরণও জুলুম অত্যাচার এবং বাইতুলমালের যদেচ্ছাচারিতার কথা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করার কথার বিবরণ দিয়েছিলেন এরূপ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে কর্তব্য বলে অবিহিত করেছিলেন।[৬]

সাথীদের প্রতি ইমাম হোসাইনের ভাষণ

ইতিমধ্যে ইমাম হোসাইন কারবালার উপকণ্ঠে পৌছে যান। 'হোসাম' নামক স্থানে তিনি সাথীদের উদ্দেশ্যে ভাষণদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসার পর বললেন ঃ

قال الامام الحسين عليه السلام بذى حسم فحمد الله واثنى عليه ثم قال : انه قد نزل من الامر ماقدترون وان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها إستمرت جدا وخسيس عيش كالمرعى الوبيل الاترون ان الحق لايعمل به وان الباطل لايتناهى عنه ليرغب المؤمن فى لقاء الله محقا فانى لارى الموت الاشهادة ولاالحياة مع الظالمين الابرما -

(طبرى ج٥ ص٢٢٩ س٢١٥)

-"তোমরা লক্ষ্য করছ, ব্যাপারটি কোন দিকে গড়াচ্ছে। দুনিয়া বদলেগেছে এবং অচেনা রূপধারণ করেছে। ভাল পেছন ফিরে চলে গেছে এবং অধিক কঠিন হতে চলেছে। নিকৃষ্ট জীবন অমনোরম চারণ ভূমি স্বরূপ। তোমরাকি দেখছনা ন্যায়ের উপর কেউ চলছেনা এবং অন্যায় পরিহার করে চলা হচ্ছেনা। ইমানদারকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের প্রতি আগ্রহ দেখাতে হবে। আমিতো মৃত্যুকে শাহাদাত বলে জানি। আর জালিমদের সাথে বসবাস করাকে অস্বস্তিকর মনে করি।"[৭]

ইমাম হোসাইনের ভাষণটি লক্ষ্য করার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষতঃ এযুগের ইসলামী হুকমতপন্থীদের এদিকে লক্ষ্য দেয়া দরকার। প্রতিকূল অবস্থায় বাতিলের সাথে মিটমাট করে ফেলার প্রবণতা ইসলামী বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করে। মহা বিপদের ঘন্টাধ্বনি শোনা গেলেও আপোষ করতে নেই। ইমাম হোসাইনের ভাষণ তাই প্রমাণ করে। দুনিয়ার প্রলোভন ও ভয়ভীতির তোওয়াক্কা না করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে চলতে হবে। শাহাদাত একজন মুজাহিদের চরম ও পরম লক্ষ্য। অন্যায়কারী জালিমের সাথে সুখে বসবাস করার চেয়ে শাহাদাতের মৃত্যুই শ্রেয়। আর শাহাদাতের মৃত্যু গৌরবের। তাই ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে স্বাগত জানাতে হবে। আর জালিমদের

সাথে আপোষ করে চলাকে অপ্রীতিকর ও অস্বস্তিকর মনে করতে হবে। শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইনের শেষোক্ত বাক্যগুলো সর্বদা সামনে রাখতে হবেঃ "আমি তো মৃত্যুকে শাহাদাত বলে মনে করি। আর জালিমের সাথে বসবাস করাকে অস্বস্তিকর বলে মনেকরি"—

(فانى لارى الموت الاشهادة ولاالحياة مع الظالمين الابرما)

আর ইমাম হোসাইনের এবাক্যংশও স্মরণরাখার মতঃ "ইমানদারকে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের প্রতি আগ্রহ দেখাতে হবে—"

(ليرغب المؤمن فى لقاء الله محقا)

যোহাইর ইবনু কাইনের ঈমান দীপ্ত ভাষণ

বর্ণনাকারী বলেনঃ ইমাম হোসাইনের উল্লিখিত ভাষণ শুনে যোহাইর ইবনুল কাইন বাজালী সফর সাথীদেরকে বলেনঃ তোমরা কথা বলবে না আমি কথা বলব? সকলেই বলল যে, না, তুমিই বল। তিনি উঠে আল্লাহর প্রশংসান্তে বললেনঃ আল্লাহ আপনাকে ন্যায়ের পথ দেখান, এটাই কামনাকরি। আল্লাহর কসম দুনিয়া যদি আমাদের জন্য চিরস্থায়ী হত এবং আমরা যদি চিরদিন দুনিয়াতে থাকতে পারতাম আর আপনাকে সাহায্য করতে এবং আপার সাথে সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে তা ত্যাগও করতে হত, তবু আমরা আপনার সঙ্গনেয়াকে চিরস্থায়ী দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিতাম।[৮]

(والله لوكانت الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين الا ان فراقك

فى نصرك ومواساتك لآثرنا الخروج معك على الاقامة فيها)

(الطبرى ج٥ ص٢٢٩ س٢١ه)

—এখানে ইসলামী হুকুমাত পন্থীদের জন্য সংগ্রামী জীবনের পাথেয়স্বরূপ উপদেশ গ্রহণের কথা রয়েছে। নেতার প্রতি আনুগত্যের মনোভাব কিরূপ থাকাচাই তাও বুঝে নেয়ার উপকরণ রয়েছে। এরূপ নিবেদিত প্রাণ কর্মীরাই আজো ইসলামে বিকৃতির যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে যাচ্ছে জীবনের বিনিময়ে। লাখো সালাম ইসলামী বিপ্লবের মৃত্যুঞ্জয়ী কর্মীদের প্রতি।

মৃত্যুঞ্জয়ী ইমাম হোসাইন

হুর ইবনু এজিদের সামনেই ইমাম হোসাইনের শাহাদাত পাগল কাফেলার লোকদের এসব কথাবার্তা চলছিল। হুর, ইমাম হোসাইনকে সাবধান করে দিয়ে বলেনঃ

ياحسين ! انى اذكر الله فى نفسك فانى اشهد لئن قاتلت لتقتلن ولئن قوتلت لتهلكن فيما ارى -

—"ওহে হোসাইন! তোমার জীবনের ব্যাপারে আমি তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি নির্দ্বিধায় বলছি তুমি যদি যুদ্ধ বাঁধাও নির্ঘাত নিহত হবে। আর যদি তোমার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ইমাম হুর ইবনু এজিদের ভীতিপ্রদ বচনশুনে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় হুংকার দিয়ে বললেনঃ

فقال له الحسين افبالموت تخوفنى ؟ وهل يعدوبكم الخطب ان تقتلونى ؟ ماادرى ماقول لك ! ولكن اقول كما قال اخو الدوس لابن عمه ولقيه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اين تريد فانك مقتول فقال :

سامضى ومابالموت عارعلى الفتى
اذا مانوى حقا وجاهد مسلما -
وآسى الرجال الصالحين بنفسه
وفارق مثبورا يغش ويرغما -

(الطبرى ج٥ ص.٢٣ س٢١ه)

—"তুমি কি আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছ? সমস্যা কি তোমাদেরকে আমাকে কতল করা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে? জানিনা আমি তোমাকে কি বলব? হাঁ, তাই বলব–যা দাউস গোত্রীয় একব্যক্তি তার চাচাতো ভাইকে বলেছিল। চাচাতো ভাইটি তাকে দেখতে পায় যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করার জন্য যাচ্ছেন। তখন সে তাঁকে বললঃ কোথায় যাচ্ছো? তুমিতো নির্ঘাত মারা পড়বে। উত্তরে দাউসী বলেন ঃ

আমি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চলছি। আর যুবকের জন্য মরে যাওয়া কোন দোষের নয় যদি সে ন্যায়ের পক্ষে থাকে এবং মুসলিম রূপে জিহাদ করে আর সৎ লোকদের জন্য জান কুরবান করে সহানুভূতি প্রদর্শন করে। আর ধ্বংসোন্মুক ব্যক্তি হতে সরে থাকে যে ধোঁকা দেয় ও হেয় প্রতিপন্ন হয়।"[৯]

আর আল্লামা ইবনুল আসীর (রঃ) পংতিগুলো নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেনঃ

سامضى وما بالموت عار على الفتى

اذا مانوى خيرا او جاهد مسلما -

فان عشت لم اندم وان مت لم الم

كفى بك ذلا ان تعيش وترغما -

—"দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আমি চললাম। আর মৃত্যুতে যুবকের কুণ্ঠা থাকার কথা নয় যদি সে কল্যাণের অভিপ্রায় রাখে এবং মুসলমানরূপে জিহাদে অংশ নেয়। যদি জীবিত থাকি তাহলে লজ্জা নেই। আর যদি মরে যাই দুঃখ নিয়ে মরবনা। তোমার হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে তুমি বেঁচে থাকবে আর অপমানিত হবে।"[১০]

ইমাম হোসাইন শহীদ হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে উক্ত পংতিগুলো আবৃতি করেছিলেন। এ যুগের ইসলামী হুকুমত পন্থীদের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।

দুনিয়াদারের চরিত্র

والدين لعق على السنهم يحوطونه مادرت معائشهم
فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون -

(الامام حسين)

"জীবিকার সংস্থান যতক্ষণ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ মানুষের কাছে দ্বীন থাকে একটি চোষ্য বস্তু। আর বালা মুসিবতের মধ্যে ফেলে ধোলাই করা হলেই দ্বীনদারের সংখ্যা কমে যায়।

'ইমাম হোসাইন'

تحف العقول ص. ٢٥ -

মহল বিশেষের স্বার্থপূজা

ইসলামী সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠলে জনতা স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে যোগদান করে। আন্দোলনের গণচরিত্র দেখে ক্ষমতাসীনরা আৎকে ওঠে। আন্দোলন বানচাল করার জন্য সম্ভাব্য সব রকম উপায় অবলম্বন করে। অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে। প্রলোভনের মুলা জুলিয়ে রাখে। অর্থ বিলিয়ে অনর্থের সৃষ্টি করে। যুগে যুগে এমনটিই দেখা যায়। কিন্তু সত্যিকারের সংগ্রামী প্রলোভনে নাপড়ে জেল জুলুমের ভয় নাকরে উদ্দেশ্যের প্রতি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যায়। তখনজনমনে আরও প্রত্যয় জন্মায়। তারা অস্ত্রের মুকাবিলা করতে বেরিয়ে পড়ে। যার যা কিছু থাকে তানিয়েই বাতিলের মুকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে বাতিলের ঘরে ভীতির সৃষ্টি হয়। বাতিল স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। দেশছেড়ে পালিয়ে যায় বা হক পন্থীদের হাতে পরাস্ত হয়।

আর আন্দোলনের নেতৃত্বে স্বার্থপরতা ঢুকে পড়লে উল্টো ফল দাঁড়ায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার পূর্বেই স্বার্থপর কুচক্রী মহল রণে ভঙ্গ দেয়। স্বার্থ লুফে নেয়। বাতিলের সাথে মিতালি করে। বলে ইসলামের ও দেশের স্বার্থ এখানেই। তানাহলে দেশও যাবে, ইসলামও যাবে। এবং যাবে সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা। বিপন্ন হবে দেশ ও ধর্ম। অথচ অর্থের লোভে এরা বিভ্রান্ত হয়। কেউ জেলজুলুমের ভয়ে পিছ পা হয়ে যায়। ইমাম হোসাইনের সংগ্রাম এভাবে পর্যুদস্ত হয়। ইবনু যিয়াদ একদিকে ভয় ভীতির অস্ত্র ব্যবহার করে। অন্যদিকে অর্থের লোভ দেখায় সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। সুযোগ সন্ধানীরা তখন সুবর্ণ সুযোগের সদ্ ব্যবহার করে। আন্দোলনের মাথায় কুঠারাঘাত হানে। বিষয়টি পাঠকদের বোধগম্য করার লক্ষ্যে আমরা এখানে হযরতুল উস্তাজ মুফ্তী মোহাম্মাদ শফী (রাঃ)–এর ভাষায় ইবনু যিয়াদের ভাষাণটি পরিবেশন করলাম। ইবনু যিয়াদ কূফায় এসে সর্ব প্রথম এ ভাষণ দেয় ঃ

اگلے روز صبح ہوئ ابن زیادنے اہل کوفہ کو جمع کرکے ایک تقریر کی جس مین کہاکہ : امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے شہرکا حاکم بنایاہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم مین جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے - اور جو اپنے حق سے

محروم کردیا گیا ہے اس کو اسکاحق دیا جائے - اور جو شخص اطاعت وفرمابرداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوك کیا جائے - اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یاجس کی حالت اس معاملہ مین مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے -

خوب سمجھ لو کہ مین امیر المؤمنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذکرونگا - مین نیك چلن لوگون کے لیئے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والون کے لیئے حقیقی بھائی ہون اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگون کے لیئے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کرین اور میرے احکام کی مخالفت کرین، اب آپ لوگ اپنی جانون پر رحم کھائین اور بغاوت سے باز آئین -

(شہید کربلا ازمفتی محمد شفیع ص۲۸)

"পরদিন ইবনু যিয়াদ কুফাবাসীদেরকে একত্রিত করে একটি ভাষণ দেয়। ভাষণে সে বলেঃ আমীরুল মুমিনীন (এজিদ) আমাকে তোমাদের নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছে। আর নির্দেশ দিয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যে উৎপীড়িত তার সাথে যেন ইনসাফ করি। আর যাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে যেন তার হকদিই। আর যে ব্যক্তি আনুগত্য করবে, নির্দেশ মান্য করে চলবে তার সাথে উত্তম ব্যবহার করা হবে। আর যে বিরোধিতা করবে ও বিদ্রোহের ভাব দেখাবে অথবা যার প্রতি এবিষয়ে সন্দেহ হবে তার উপর চরম নির্যাতন করা হবে।

ভাল করে বুঝে নাও, আমি আমীরুল মুমিনীন (এজিদের)–এর নির্দেশের অনুগত থেকে তার নির্দেশাবলী অবশ্যই কার্যকর করব। আমি সদাচার লোকদের জন্য পিতা আর অনুগতদের জন্য সত্যিকারের ভাই। আর আমার বেত্রাঘাত আর আমার তলোয়ার শুধু তাদের জন্য যারা আমার অবাধ্য হবে। আর আমার নির্দেশের বিরোধিতা করবে।

অতএব, আপনারা নিজেদের জানের প্রতি কৃপা করবেন। আর বিদ্রোহ হতে বিরত থাকবেন।"[১১]

সেই একই কথা; স্বার্থের প্রলোভন এবং ভয়ভীতির বিভীষিকা সামনে আনা হলো। কুফাবাসীরা কাপুরুষ ও লোভীদের মতো রণেভঙ্গ দিল। স্বার্থ কুড়িয়ে নিতে শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর শুধু তাই নয় হযরত ইমাম হোসাইনের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে গেল। ফলে ইমাম পরিবার পরিজন ও সঙ্গীসাথী সহ কারবালায় শহীদ হলেন। বলা যায় এজিদ ইবনে যিয়াদ অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকরা এ ব্যাপারে অধিক অপরাধী।

ইবনু যিয়াদ ভাষণ দেয়ার পর শহরের নেতৃবর্গ দরবারের সদস্যগণকে ডেকে পাঠায়। আর তাদেরকে বলেঃ "তোমাদের শহরে বহিরাগতের এবং যারা এজিদের বিরোধী তাদের তালিকা পেশ কর। যে এরূপ লোকদের প্রতিবেদন আমার নিকট পৌঁছে দেবে তাকে নির্দোষ মনে করা হবে। আর যে তা দেবে না তাকে তার এলাকার যাবতীয় বিষয়ের জন্য দায়ী করা হবে, যাতে কেউ ওসব এলাকায় আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে নাপারে। যে এভার নেবে না আমরা তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবনা। আমরা তাকে হত্যা করে ফেলব। আর যে ব্যক্তির প্রভাব বলয়ে বর্তমান খলীফা এজিদের বিরোধী কোনো লোক পাওয়া যাবে, তাকে তারই বাড়ীর দুয়ারে ফাঁসীতে লটকিয়ে দেয়া হবে। আর দরবারে তার সদস্য পদ বাতিল করে দেয়া হবে।"১২

এজিদ স্বৈরাচারের ভীষণ সংহার মূর্তী কিরূপ ভয়াবহ ছিল আমারেদ উস্তাদ মরহুম মুফ্তী মোহাম্মাদ শাফী (রাঃ)-এর বর্ণনায় তা অবশ্যই আন্দাজ করতে পেরেছেন। ইসলামের নীতি হল ولا تكسب كل نفس الاعليها لاتزر وازرةوزراخرای " কোন ব্যক্তি অন্যের দোষে দোষী হবে না।"[১৩] এমনকি পুত্রের অপরাধে পিতাকে সাজা দেয়া যাবে না।[১৪] আর এখানে বিদেশী বহিরাগতদের জন্য শহরবাসীদেরকে দায়ী করা হচ্ছে। চালানো হচ্ছে অকথ্য অত্যাচার, এজিদী নির্যাতন করা হচ্ছে পশু সুলভ আচরণ করে। এরূপ জল্লাদের হাত হতে রক্ষা পেয়ে কোন প্রকারে মাত্র চারজন লোক কূফা থেকে বের হওয়ার দুঃসাহস দেখান। আর তাঁরা কারবালায় ইমাম হোসাইনের সাহায্যে এগিয়ে যান। হুর ইবনু এজিদ তাদেরকে বাধা দিতে উদ্যত হন। ইমাম ধমকিয়ে বলেনঃ তাঁরা আমার লোক। তাঁদেরকে বাধা দিলে

ভাল হবে না। হুর বাড়াবাড়ি করতে চান না। তাঁরা ইমাম হোসাইনের খেদমতে হাযির হন।

ইমাম তাদের নিকট কূফার খবরাখবর জানতে চান।

ثم قال لهم الحسين اخبرونى خبر الناس وراءكم فقال له مجمع بن عبد الله العائذى وهو احد النفر الاربعة الذين جاء -

"اما اشرف الناس فقد اعطيت رشوتهم وملئت غرائرهم ليستمالو هم و ليستخلص به نصيحتهم فهم الب واحد عليك - واما سائر الناس بعد فان افئدتهم تهوى اليك وسيوفهم غداً مشهورة عليك (الطبرى ج٥ ص.١٣ س٢١٥)

—"ইমাম হোসাইন আগন্তুকদেরকে বলেনঃ তোমাদের পেছনের লোকজনের সংবাদকি তাবল। মুজাম্মে ইবনু আব্দুল্লাহ আয়েযী (রঃ) উক্ত চারজনের একজন ছিলেন। তিনি বললেনঃ নেতৃস্থানীয় লোকজনকে উৎকোচ দেয়া হয়েছে। তাদের বাহনের ঝোলা ভরে দেয় হয়েছে। উদ্দেশ্য হল তাদেরকে হাত করা। ইবনু যিয়াদ এরূপে তাদের সহানুভূতি নিষকন্টক করে তুলতে চায়। কাজেই তারা আপনার বিরুদ্ধে একপ্রাণ। আর সাধারণ লোকজনের অন্তর আপনার সাথে। তাদের তরবারি আগামীদিন আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলিত হবে"[১৫]

বলা বাহুল্য, নেতৃস্থানীয় লোকেরা ইমান বিক্রি না করলে জনতা বিভ্রান্ত হতোনা। নেতারা দুষমনের সাথে হাত মিলিয়ে হালুয়া -রুটি-মিঠাই-মণ্ডার ভাগ বাঁটোয়ারা করছে। এক্ষেত্রে জনতা আর কি করতে পারে।

সূত্র সূচী ঃ

১· শহীদ কারবালা ঃ প্রণীত মুফতী মুহাম্মদ শফী ঃ ৬৪–৬৫ পৃষ্ঠা
২· বনু ইসরাঈল ঃ ৩৪ আয়াত
৩· তাবারীঃ ৫ম খন্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা, ৬০ হিজরী
৪· ঐ ঐ ২২৮ ” ৬১ ঐ
৫· ঐ ঐ ঐ ” ৬১ হিঃ
৬· ঐ ঐ ২২৯ ” ৬১ হিঃ
৭· ঐ ঐ ২২৯ ” ৬১ ,,
৮· ঐ ঐ ২২৯ ” ৬১ ”
৯· ঐ ঐ ২৩০ ” ৬১ ”
১০· শহীদে কারবালাঃ প্রণীত মুফতী মোহাম্মাদ শফী ঃ ৬৩ পৃষ্ঠা।
১১· ঐ ঃ ২৮ পৃষ্ঠা
১২· ঐ ঃ ২৯ পৃষ্ঠা
১৩· আনআম ঃ ১৬৪ আয়াত

ইমাম হোসাইনের আদর্শ বাণী

سامضى وما بالموت عار على الفتى
اذا مانوى حقا وجاهد مسلما
وآسى الرجال الصالحين بنفسه
وفارق مثبورا وخالف مجرما

(الامام حسين)

"আমি সংকল্পে দৃঢ়। বীর পুরুষের জন্য মৃত্যুতে গ্লানিনেই যদি সে ন্যায়ের পক্ষনেয় এবং মুসলিমরূপে জিহাদ করে। আর জীবনের বিনিময়ে সৎ লোকদের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। আর ধ্বংসোন্মখ ব্যক্তিহতে সরে থাকে এবং অপরাধীর বিরুদ্ধাচরণ করে"

"ইমাম হোসাইন"

بحار الانوار ج٥ ٤ص ٢٣٨

হোসাইনী দূত কায়স ইবনু মুসাহ্হার শহীদ হলেন

হযরত কায়স ইবনু মুসাহ্হার একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির নাম। তিনি ইমাম হোসাইনের দূতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শহীদ হন। ইমাম হোসাইন তাঁকে পত্র দিয়ে কুফাবাসীদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। পত্রে তাঁর নিকটে পৌঁছে যাওয়ার খবর এবং সংগ্রামের কৌশল সম্পর্কে নির্দেশনা ছিল বলে অনুমান করা হয়। কায়স ধৃত হওয়ার প্রাক্কালে পত্রটি খেয়ে ফেলেছিলেন। তাই বুঝাযায় পত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত ছিল। কায়েস দ্রুত গতিসম্পন্ন উটে আরোহণ করেন। আর গন্তব্যের পথে এগিয়ে চলেন। পথিমধ্যে এক কুয়ার নিকট বেদুইনদের তাবুতে তিনি বিশ্রাম নেন। বেদুইন পরিবার তাঁকে যত্ন করেন। আর বিশ্রাম নেয়ার পর দ্রুত সরে পড়তে বলেন। কারণ হোসাইনের আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় চতুর্দিকে এজিরেদ গুপ্ত চররা ভন্‌ভন্ করছিল। বেদুইন পরিবার ইমাম হোসাইনের দলভূক্ত হলেও সাবধানতা বশতঃ মেহমানের নিকট তা ব্যক্ত করেননি। কায়স ক্লান্ত ছিলেন। মনোরম স্থান পেয়ে এখানে দেরি করে ফেলেন। ইত্যবসরে এজিদের লোকেরা সেখানে পৌঁছে যায়। বেদুইন বুড়ো কায়সকে সাবধান করেন। কায়স উটের পাশ ঘেষে শয্যা গ্রহণ করেন। উপরে কম্বল ঢেলে তাঁকে আড়াল করে রাখা হয়। কায়স পালাবার চেষ্টা করেন। এজিদের টহলবা-হিনী এসে যায়। তারা পানি সংগ্রহের জন্য কূয়ার পাড়ে আসে। বুড়োকে তাঁর পরিবারসহ দেখতে পায়। ক্ষুধা-পিপসার তাড়নায় এবং সফরের ক্লান্তি দূর করার জন্য তারা বুড়োর মেঘ পালের মেষ যবাই করে খাওয়া দাওয়ার তালে মেতে উঠে। এই ফাঁকে কয়স এজিদের টহল বাহিনীর তিনটি ঘোড়া এক সাথে বেঁধে নিয়ে পালিয়ে যায়। কিছু দূর গিয়ে দু'টি ঘোড়া রেখে আর একটির উপর সাওয়ার হয়ে ফিরে আসে। আর টহল বাহিনীর একজনকে হত্যা করে। বাকী দু'জন যখম হয়। ইত্যবসরে এজিদের অপরবাহিনী এসে পড়ে। কায়স এখন পালাতে ব্যর্থ হন। ধৃত হয়ে ইবনু যিয়াদের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। নির্যাতন ভোগ করেন। বেদুইন পরিবারও গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আসে। সেখানে তারা সবাই নির্যাতিত। দেখা দেয় কারাবিদ্রোহ। শক্ত হাতে ইবনু যিয়াদ তা দমন করে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। দেখলে চোখে পানি এসে যায়। কয়সের সাথে ইবনু যিয়াদের নরম গরম সংলাপ চলতে থাকে। জল্লাদের বেত্রাঘাতে কয়সের দেহের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে যেতে থাকে। তবুও ইবনে যিয়াদ ইমাম হোসাইনের গোপন সংবাদ আদায় করতে পারেনি তাঁর নিকট হতে। ইবনু যিয়াদ তাঁর ধৈর্যের সামনে হার মানে। বলে যদি তুমি আলী ও হোসাইনকে গালমন্দ কর এবং

এজিদের প্রশংসা কর তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। এ শর্তে তাঁকে কারাগার হতে বের করে জনতার সামনে পৌঁছে দেয়া হয়। সামনে জনতার ভীড়। কয়েস জনতার সামনে নির্ভীকচিত্তে ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহর হামদ পাঠান্তে বলেন ঃ

"হে কূফাবাসীগণ! হযরত হোসাইন ইবনু আলী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে হযরত ফাতিমার সন্তান, আলীর বেটা, বর্তমানে আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির উত্তম তিনি। আমি তোমাদের নিকট তাঁর দূত হয়ে এসেছি। তিনি 'হাজির' নামক স্থান পর্যন্ত এসে গেছেন। তোমরা সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো।"

ভাষণে কয়স হযতর হোসাইন ও হযরত আলীর ভূয়শী প্রশংসা করেন। আর ইবনু যিয়াদ এবং এজিদকে গালমন্দ করেন। ইবনু যিয়াদ এতে পাগল কুকুরের ন্যায় ক্ষেপে যায়। আর কূফা নগর টাওয়ারের উচ্চতর স্তর থেকে তাঁকে জীবিত ফেলে দিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। তাই করা হল। তাঁকে উপর থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়। তাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়।[১] আর তাঁর প্রবিত্র আত্মা বেহেশতে স্থানান্তরিত হয়। কূফা হতে আগত চারজন হযরত ইমাম হোসাইনকে কায়স ইবনু মুসাহহারের এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর পৌঁছায়। ইমাম তখন ইন্নালিল্লাহ পড়েন। আর কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

مِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيْلاً -

اللهم اجعل لنا ولهم الجنة نزلا واجمع بيننا وبينهم فى مستقر من رحمتك ورغائب مذخور ثوابك (الطبرى ج٥ ص.٢٣ س٦١٠)

"তাদের মধ্যে কেউ নিজের অংশপূর্ণ করেছে, আর কেউ অপেক্ষায় আছে। আর তারা বিন্দু মাত্র পরিবর্তন করেনি।" আল্লাহ! তুমি আমাদের ও তাদের জন্য জান্নাতে আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। আর আমাদের এবং তাদেরকে তোমার দয়ার অবস্থানে একত্রিত কর। মনোরম সামগ্রীর ব্যবস্থা কর। তোমার প্রতিদান সংরক্ষিত।"[২]

ধন্য কয়েস ইবনু মুসাহহার। তুমি এজগতেই ইমাম হোসাইনের মকবুল দোওয়ার অধিকারী হলে। পরকালে তুমি ইমামের নৈকট্য লাভ করবে। তোমাকে সান্নিধ্য দান করার জন্য খোদ ইমামই আগ্রহী। জান্নাতের অনন্ত নেয়ামতের অধীকারী তুমি। ইমাম তাঁর এ দোওয়ায় তাই চেয়েছেন। তোমার প্রাপ্য অসীম যা আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত বলে ইমাম দোওয়াতে বলেছেন।

رسلهم فانا منصرف عنهم -

فلما قرأ الكتاب على ابن زياد قال :

الآن اذ علقت مخالبنا به -

يرجو النجاة ولات حين مناص -

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, অতঃপর আমি হোসাইনের মুকাবিলায় আসার পর তাঁর নিকট লোক পাঠিয়ে কেন তিনি আসলেন এবং কি তিনি চান তা অবগত হই। তিনি বলেন ঃ অত্র এলাকাবাসী তাঁকে পত্র লিখেছে, তাঁর নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়েছে তাদের নিকট আসার জন্য। এ জন্য তিনি আগমন করেছেন। তারা যদি তার আসাকে অপসন্দ করে, তাদের মত যদি পাল্টে গিয়ে থাকে তাহলে তিনি ফিরে চলে যাবেন।"

ইবনু যিয়াদ এপত্র পাঠে বলল। এখন ? যখন আমাদের খামছাগুলো তার গায়ে বসে গেছে সে নাজাতের আশা রাখে ? ছুটে যাওয়ার সময় অতিবাহিত হয়েগেছে।

এ পত্রের জবাবে ইবনু যিয়াদ বাইআত করার আহবান জানিয়ে পত্র পাঠায়। পত্রে সে বলে ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم : اما بعد فقد بلغنى كتابك وفهمت ما ذكرت فاعرض على الحسين ان يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع اصحابه فاذا فعل ذلك رأينا رأينا والسلام -

(طبرى ج٥ ص٢٣٤ س٦٢٥)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, অতঃপর তোমার পত্র পেয়েছি। যা বলতে চেয়েছ, তা বুঝেছি। এখন হোসাইনের নিকট প্রস্তাব কর তিনি এবং তার সকল সাথীরা যেন মুআবিয়ার পুত্র এজিদের জন্য বায়আত করেন। এ কাজ সম্পন্ন হলে পরবর্তী পদক্ষেপে কি করতে হয় তা আমরা দেখব। ইতি।" [৫]

উমর ইবনু সা'দের পত্রে ইমাম হোসাইনের পক্ষ থেকে শুধু ফিরে যাওয়ার কথার উল্লেখ দেখা যায়। এজিদের হাতে বায়আত করার প্রস্তাবের উল্লেখ নেই। ইমাম হোসাইন এজিদের হাতে তার নিকট গিয়ে আয়আত করার প্রস্তাব দিয়ে থাকলে পত্রে উমর ইবনু সা'দ তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন। তিনি তা করেননি। আর ইমামের তরফ হতে বায়আতের প্রস্তাব দেয়া হলে ইবনু যিয়াদের পত্রে পুনরায় বায়আত আদায়ের তাগিত আসত না। এতে বুঝা গেল ইমাম ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে এজিদের হাতে বায়আত করার প্রস্তাব করেননি। এ প্রসঙ্গে আমরা উতবা ইবনু সামআনের স্পষ্ট বক্তব্য উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন ইমাম হোসাইনের একান্ত সচিব। তিনি বলেছেন ঃ মক্কা হতে ইরাকের পথে বা কারবালায় কোন সময় ইমাম হোসাইন বায়আতের প্রস্তাবে রাযী হননি।৬ আর বায়আত করবেন না বলেই তিনি মদীনা থেকে চলে এসেছিলেন। কাজেই বায়আতের প্রস্তাব আসলেও ইমাম হোসাইন কখনো এতে রাযী হননি।

ইবনু যিয়াদের এ পত্রের পর ইমাম বায়আত করতে রাযী হননি। তখন সে পানি বন্ধ করে দেয়ার অমানবিক নির্দেশ জারী করে। মহররমের ৭ তারিখ থেকে তার নির্দেশে উমর ইবনু সাদ পানি বন্ধ করে দেয়। উমর ইবনু সাদ অপোষকামী ছিল। ইবনু যিয়াদের বাড়াবাড়ির তুলনায় সে উভয়ের মধ্যে নিরাপদ পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিল। কারণ ইমাম হোসাইনের বিরুদ্ধে সেনাপ্রধান হয়ে উমর ইবনু সাআদ আসে। যুদ্ধ হলে প্রত্যক্ষভাবে তাকেই দায়িত্ব নিয়ে ইমাম হোসাইনকে হত্যা করতে হবে বলে আশংকা ছিল। এদিকে শিমার ইবনু যুলজাউশান উমর ইবনু সাদের প্রতিপক্ষ ছিল। তাদের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা চলত। শিমার হোসাইনের ব্যাপারেও ইবনু যিয়াদের অনুগ্রহ লাভের আশায় উমর ইবনু সাদের কাজে ত্রুটি খুঁজে বের করত। উমর উবনু সাদ বিষয়টি রফাদফা করতে চায়। আর শিমার গোলযোগ বাধাতে বদ্ধপরিকর। এক পর্যায়ে শিমার ইবনু যুলজাউশান ইবনু যিয়াদকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, উমর ইবনু সাদের কারণেই হোসাইন আসকারা পাচ্ছেন। আত্মসমর্পন করছেন না। তাকে সেনা নায়ক করা হলে সে এ সমস্যার ইতি টানতে পারবে। ইবনু যিয়াদ তাই ভাবল। সে উমর ইবনু সাদকে লিখে পাঠায়। নিদের্শ মত কাজ কর। নইলে সেনা নায়কের পদ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াও। শিমার ইবনু যুলজাউশান স্থলাভিষিক্ত হবে। এ মর্মে পত্র লিখে শিমারের হাতেই ইবনু যিয়াদ পত্রটি পাঠায়। শিমার পত্র নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে যায়। ইবনু যিয়াদের পত্রটি এখানে পরিবেশন করা হলো ঃ

اما بعد فانى لم ابعثك الى حسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولالتمنيه السلامة والبقاء ولاتقعد له عندى شافعا -

انظر فان نزل حسين واصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم الى سلما وان ابوا فازحف اليهم حتى تقتلهم

وتمثل بهم فانهم لذالك مستحقون -

فان قتل حسين فاوط الخيل صدره وظهره فانه عاق مشاق قاطع ظلوم، ليس دهرى فى هذا ان يضر بعد الموت شيئا - ولكن علىّ قول : لوقتلته فعلت هذا به ان انت مضيت لامرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع - وان ابيت فاعتزل عملنا وجندنا وخل بين شمرين ذى الجوشن و بين العسكر فانا قد امرناه بامرنا والسلام - (الطبرى ج٥ ص٢٣٦ س٢١٠)

"অতঃপর অবগত হও। হোসাইনকে রক্ষা করার জন্য আমি তোমাকে তাঁর নিকট পাঠাইনি। আর তাঁর সাথে দীর্ঘ আলাপ চালানোর জন্যও তোমাকে পাঠানো হয়নি। তাঁকে নিরাপত্তা দান ও টিকে থাকার আশা দেয়ার জন্য ও পাঠাইনি। আর তুমি তাঁর পক্ষ নিয়ে আমার নিকট সুপারিশ করে প্রস্তাব পাঠাবে সে জন্য তোমাকে প্রেরণ করিনি। দেখ হোসাইনও তাঁর সঙ্গীরা নির্দেশ মত আত্মসতর্পন করলে তাঁদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেবে। তা করতে অস্বীকার করলে তার উপর হামলা চালাবে। তারপর তাদেরকে হত্যা করবে। তাদের লাশ বিকৃত করবে। কারণ তারা এরূপ সাজার উপযুক্ত।

হোসাইন নিহত হলে তাঁর পিঠ ও বুকের উপরে অশ্ববাহিনী দাবড়িয়ে দেবে। কারণ সে অবাধ্য বিদ্রোহী সম্পর্কচ্ছেদকারী, প্রচণ্ড জালেম। এ কাজে আমার জামানার ভয় নেই যে মৃত্যুর পর জামানা আমার কোন ক্ষতি করবে। তবে আমি কথা দিচ্ছি যে, তুমি যদি তাঁকে হত্যা কর, হত্যার পর এসব কর্ম কর, যদি তুমি তার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ কার্যকর কর তাহলে তোমাকে আমরা প্রতিদান দেব। প্রতিদান হচ্ছে শ্রবণকারী ও অনুগতের জন্য। আর যদি তা করতে তুমি অস্বীকারই কর, তাহলে আমাদের কর্মচারীর পদ থেকে সরে দাঁড়াবে। আমাদের সেনাদল থেকে সরে যাবে। সেনাবাহিনী ও শিমার ইবনু যুলজাউশনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হবে না। আমরা তাকে আমাদের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি।"৭

এ কঠোর নির্দেশের নির্যাস হল, শিমার ইবনু যুলজাউশানকে ভাবি সেনাপতি ও উমর ইবনু সাদের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। যাতে দ্বিধাহীনভাবে ইবনু যিয়াদ হযরত হোসাইনের হত্যাকণ্ড সংঘটিত করতে পারে। ইতিপূর্বে রাই প্রদেশের প্রাদেশিক কর্মকর্তার পদ লাভের জন্য শিমার ও উমর ইবনে সা'দের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। উমরকে রাই প্রদেশের কর্মকর্তা বানিয়ে দেয় ইবনু যিয়াদ। এরি মধ্যে

হোসাইনের সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। উমর সিদ্ধান্ত মোতাবিক রাই প্রদেশে চলে যেতে চায়। কিন্তু ইবনু যিয়াদ বলে যে হোসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না গেলে রাইয়ের কর্তৃত্ব হারাতে হবে। তাই উমর ইবনু সা'দ ইমাম হোসাইনের মুকাবিলায় এসে যায়। তার হাতে বিপর্যয় ঘটে। দুঃখের বিষয়, এনাম পাওয়ার আশায় এবং রাই প্রদেশের কর্মকর্তা হওয়ার লোভে উমর ইবনু সা'দ আখিরাত বরবাদ করে। কারবালার যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য এ দুরাচারই সবের আগে ইমাম হোসাইনের কাফেলার উপর তীর নিক্ষেপ করে। লোকদেরকে সাক্ষ্য রাখে যে সেই প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেছে। ইবনু যিয়াদের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে বেহেস্তের সরদার ইমাম হোসাইনের বুকের উপর দিয়ে অশ্ববাহিনী দাবড়িয়ে দিয়ে তার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছে। হ্যাঁ আমরা তার এ জুলুমের প্রতিশোধের দৃশ্য দেখতে চাই হাশরের ময়দানে। যে ইবনু যিয়াদ জোর গলায় বলল যে, সে আখিরাতে কি হবে না হবে তা নিয়ে চিন্তা করে না তার ঈমান নিয়েই প্রশ্ন তোলা যায়।

সাথীদের প্রতি ইমামের শেষ ভাষণ

মহররমের নয় তারিখ রাতে সকল সাথীকে একত্রিত করে ইমাম হোসইন বলেন ঃ

اما بعد فانى لا اعلم اصحابا اولى ولا خيرا من اصحابى ولا اهلا اوصل من اهل بيتى - فجزا كم الله عنى جميعا خيرا - الا وانى اظن يومنا من هؤلاء الاعداء غدا الا وانى قدرآيت بكم فانطلقوا جميعا فى حل ليس عليكم منى ذمام - هذا ليل قد غشيكم فاتخذوه جملا -

(الطبرى ج٥ ص.٢٤ س٦١٠)

"অতঃপর আমি আমার সাথীদের চেয়ে উত্তম ও ভাল কারো সাথী দেখতে পাই না। আর আমার পরিবার বর্গের চেয়ে পারিবারিক সৌজন্য রক্ষাকারী কোন পরিবার দেখি না। তাই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে যেন আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দেন। শোন, আমি মনে করি আগামীকাল এদের সাথে আমাদের যুদ্ধ বেধে যাবে। শোন, আর আমি তোমাদের ব্যাপারে ভেবেছি। তোমারা সকলেই চলে যাও। আমার

পক্ষ হতে তোমাদের চলে যাওয়াকে বৈধ করে দিলাম। আমার তরফ হতে তোমাদের উপর আমার কোনরূপ দাবী নেই। এই যে রাত তোমাদের প্রতি অন্ধকার হয়ে আসছে। রাতকে তোমরা সুবর্ণ সুযোগ মনে কর।"[৮]

ইমাম হোসাইনের সাথীরা একবাক্যে ইমামের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। তাঁরা বললেন ঃ আমরা আপনাকে ফেলে কোথাও যাব না। ইমাম মুসলিম ইবনু আকীলের ছেলেদেরকে বললেন ঃ তোমাদের পিতা প্রাণ দিয়েছেন। এই যথেষ্ট, তোমরা চলে যাও। তাঁরা বললেন ঃ লোকেরা বলবে আপন মুরব্বীকে ফেলে চলে এসেছো? আমরা আপনার সামনে শহীদ হব। পালাব না। এভাবে কেউ ইমাম হোসাইনকে ফেলে চলে যেতে রাযী হলনা।

যায়নাব কেঁদে ফেললেন

শিমার ইবনে যুল জাউশান নয় মহররম ইবনু যিয়াদের নির্দেশ নিয়ে উমর ইবনু সাদ–এর নিকট হাযির হয়। তখন সে নাবলেই ৯ মহররম যুদ্ধের জন্য সৈন্য পরিচালনা করে। কলরব শুনে ইমাম হোসাইন উমর ইবনু সাদকে বলেন ঃ আজ রাত একটু সময় দাও। আল্লাহকে ডেকে নেই। ইবাদত করে নেই। আগামীকাল যা করতে চাও করবে। উমর ইবনু সাদ একরাতের অবকাশ দিল। এভাবে নয় তারিখের যুদ্ধ ১০ মহররম পিছিয়ে গেল। আর এ রাতেই সবাইকে নিয়ে ইমাম রাত্রি যাপন করেন ইবাদতের মধ্যদিয়ে। রাতে ইমামের সামান্য চোখ লেগে যায়। ইমাম শব্দ করে ঘুম হতে উঠে পড়েন। হযরত যায়নাব দৌড়ে এসে কি হল জানতে চাইলেন। ইমাম বললেন ঃ এক্ষুণি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন। তিনি বললেনঃ হোসাইন কিছুক্ষণ পর তুমি আমাদের সাথে এসে যাবে।[৯] এ কথা শুনে হযরত যায়নাব কেঁদে ফেললেন। ইমাম হোসাইন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ

وقال لها ياأخية انى اقسم عليك فابرى قسمى لاتشقى على جيبا ولا تخمشى علىّ وجهاً ولاتدعى علّى بالويل والثبور اذا انا هلكت - (طبرى ج٥ ص.٢٤ س٢١،)

বোনটি আমার! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি। তুমি আমার কসম পূর্ণ করবে। আমার জন্য শোক করে কুর্তার বুক ছিঁড়বে না, মুখমণ্ড খামচে বিশ্রী করবে না, হা হুতাশ করে কাঁদবে না। এবং বিলাপও করবে না--যখন আমি থাকব না।"[১০]

বস্তুতঃ প্রিয়জনের জন্য শোকাবিভূত হওয়া নিষিদ্ধ নয়। তবে মহররম মাসের শোক সভায় নিজ দেহে প্রচণ্ড আঘাত হানা, নিজেকে আহত করা শিয়া মাযহাবেও বাঞ্ছনীয়নয়।[১১] ইমাম হোসাইনের জন্য মহররমে মাতম করা হয় তাঁর ত্যাগের কথা স্মরণ করে। উমাইয়্যা যুগের ইসলামের মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ইসলামের শিক্ষাকে কলুষ মুক্ত রাখার নিমিত্তেই ইমাম হোসাইনের শাহাদাত। শরীঅতের বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে মহররমে শোক পালন তথা ইমাম হোসাইনের জীবনী আলোচনা করা যায়। তাঁর জন্য চোখের পানি বিসর্জন দেয়া যায়।

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) ইমাম হোসাইন ও শহীদ ইমাম যায়েদের জন্য কেঁদে শোক করেছেন।[১২] মহররম মাসের শোক সভাগুলোকে ইসলামী বিপ্লবের প্রেরণা যোগানের জন্য ব্যবহার করা যায়। ইমাম খোমেনী বলেছেন ঃ কুল্লু আরদি কারবালা, কুল্লু ইয়াউমিন আশুরাআ। অর্থাৎ সবখানেই কারবালা সব দিনই আশুরাআ। ন্যায়–সৈনিককে যেখানেই শহীদ করা হয় সেখাইে কারবালা। আর যেদিনই হত্যাকাণ্ড হয় সেদিনই মহররমের দশ তারিখ আশুরার দিন।

ইমাম হোসাইন স্মরণে ইমাম আবু হানীফা

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) ইমাম হোসাইনের জন্য কেঁদেছেন। এরূপ অকৃত্রিম শোক প্রকাশে বাধা নেই। নবী পরিবারের ইমামগণের জন্য ইমাম আবু হানীফার শোক প্রকাশের ঘটনা বর্ণনা করে মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী বলেন ঃ

(یبکی کلما ذکر مقتله)

যখনই তিনি তাঁকে স্মরন করতেন কাঁদতেন

حضرت زید کے شہید ہو جانے اور وہ بھی اس بے کسی کے ساتھ شہید ہو جانے کاخیال امام کوجب آتا تو رودیتے تھے ۔

"হযরত যায়েদের শহীদ হওয়া তাও এরূপ অসহায় অবস্থায় শাহাদাত বরণ করার চিন্তা উদয় হলেই ইমাম আবু হানীফা কেঁদে ফেলতেন।"

ان لوگون کے لیئے جو حضرت زید کے جدامجد امام حسین

علیہ السلام کی شہادت کے متعلق اسی کیفیت کو اپنے اندر رکھتے ہین یعنی واقعہ کر بلا جب یادآجاتاھے تو بے اختیار ان پر گریہ طاری ہوجاتاھے کیا امام ابوحنیفہ کی یہ حالت ان کے لیئے نمونہ بن سکتی ھے ؟

"যাঁরা হযরত যায়েদ শহীদের শ্রদ্ধেয় দাদা হযরত ইমাম হোসাইন আলায়হিস সালামের শহীদ হওয়ার ব্যাপারে এরূপ অনুভূতি নিজেদের মধ্যে অনুভব করেন তাদের জন্য অর্থাৎ কারবালার ঘটনা যখন স্মরণে এসে যায় তখন অবলীলাক্রমে কেঁদে ফেলেন ইমাম আবু হানীফার (রাঃ) এ অবস্থা কি দৃষ্টান্ত হতে পারে না?"

..... واقعات کربلاسے اضطراراً تاثر پیغمبر کے اھل بیت سے قلبی تعلق کی دلیل ھے خود امام کے رجمانات کا بھی اس سلسلہ مین کچھ پتہ چلتاھے -
(امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی ص.۹)

(---------) -"অবলীলাক্রমে কারবালার ঘটনা প্রবাহ থেকে প্রভাবান্বিত হওয়া পয়গাম্বারের পরিবারের সাথে আন্তরিক সম্পর্কের প্রমাণ। স্বয়ং ইমাম আবু হানিফার (রাঃ) মনোভাব থেকে এক্ষেত্রে কিছুটা অনুমান করা যায়।" ১৩

মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী বলতে চাচ্ছেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম হোসাইনের জন্য শোক করেছেন, কেঁদেছেন। এরূপ অকৃত্রিম শোক প্রকাশ কাম্য। কারবালার ঘটনা প্রবাহ স্মরণ করে অন্তরে ব্যাথানুভব করা নবী পরিবারের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখার আলামত। বিশেষ সম্প্রদায়ের হুবহু অনুকরণ না করেও নিজেদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের দিন একটু সমবেদনা প্রকাশের অবস্থা সৃষ্টি করা কি কাম্য নয়? আমরা সেদিন আমাদের অন্তরকে কেমন দেখতে পাই? আনন্দিত না দুঃখিত? নিজেদের বিচার নিজেরা করে ফেললেই চলে। অন্ততঃ এজিদী চরিত্রের অভিনয় করা ঠিক নয়। সুখের বিষয় আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে আশুরার দিন কর্মবিরতি থাকে। তারি সাথে আলোচনা-সভা হলে মন্দ কি?

সূত্র সূচী ঃ

১· শহীদে কারবালা ঃ মুফতী মোঃ শফী ঃ ৫৩ পৃষ্ঠা।
২· তারাবী ঃ ৫ম খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা ৬১ হিজরী সাল।
৩· তাবাবী ঃ ঐ ২৩২ " ৬১ " "
৪·
৫· তাবাবী ঃ ৫ম খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, ৬১ হিজরী সাল।
৬· তাবাবী ঃ ৫ম খণ্ড, ২৩৫ " ৬১ " "
৭· তাবাবী ঃ ঐ ২৩৬ " ৬১ " "
৮· তাবাবী ঃ ঐ ২৪০ " ৬১ " "
৯· শহীদে কারবাল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী ঃ ৭২ পৃষ্ঠা।
১০· তাবাবী ঃ ৫ম খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা, ৬১ পৃষ্ঠা।
১১· নিউজ লেটার (বাংলা) ঃ আগস্ট ১৯৯৪ ইং, ১৬তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।
১২· ইমাম আবু হানীফা কী সিয়াসী যিন্দিগী ঃ ৯০ পৃষ্ঠা, টীকা নং-১।
১৩· ঐ ঐ ঐ ঐ ৯০ পৃষ্ঠা, ঐ ঐ

জালিমের সাথে সহঅবস্থান

انى لا ارى الموت الاسعادة والحياة مع الظالمين الابرما -
(الامام حسين)

"মৃত্যু আমার সৌভাগ্য।
জালিমের সহযোগী জীবন
আমার জন্য
অবমাননাকর।"

—ইমাম হোসাইন

بحار الانوار ج٥ ص.٥)

কারবালায় ইমাম হোসাইনের হৃদয়বিদারক ভাষণ

আমরা আলোচনার সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনার পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। মহররমের দশ তারিখ। ৬১ হিজরী সাল। এ দিনটি পূর্বেই আশুরা বলে খ্যাতি লাভ করে। বিশ্বের অনেক বড় বড় ঘটনা ভাল কি মন্দ এদিনে সংঘটিত হয়। হযরত ইমাম হোসাইনের মর্মান্তিক শাহাদাত ও এদিনে ঘটেছে। ইহুদীদের ধর্ম চর্চায় এ দিনটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ দিনে তারা নীলনদ পার হয়ে ফেরাউনের নির্যাতন থেকে খালাস পায়। ইমাম হোসাইনের আত্মাও এ দিনে এজিদী নিপীড়ন থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পান। হযরত ইমাম হোসাইন মনে পূর্ণ আবেগ নিয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কারবালার আসন্ন রক্তাক্ত প্রান্তরে এজিদের সেনা নায়ক ও সাধারণ সৈনিকদেরকে লক্ষ্য করে করুন সুরে একটি ভাষণ দান করেন। একান্ত মর্মস্পর্শী ভাষণ। তাঁর ভাষণের প্রত্যেকটি বাক্য পাষাণকে গলিয়ে পানি করে দেয়ার মত ছিল। কিন্তু এজিদের পাষাণ প্রাণ সেনা নায়ক ও সৈনিকদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করল না। তারা যেন আরও কঠিন পাথরের ন্যায় হয়ে গেল। সুশীতল বারিধারা বাগানে ফুল ফুটায় আর বিষ্টা আবর্জনায় পতিত হলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। তাই ঘটে গেল। মানবতার কলংক এজিদ বাহিনী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাল। কাপুরুষের ন্যায় পাঁচ হাজার সেনা মাত্র ৭০ জন নর-নারীর উপর পৈশাচিক উল্লাসে আক্রমণ চালাল। আর নিজেদের আখেরাত বরবাদ করে ফেলল। ইমাম হোসাইন তাঁর পাথর গালানো ভাষণে বলেন ঃ

ايها الناس ! اسمعوا قولى ولاتعجلونى حتى اعظكم بمالحق لكم على وحتى اعتذر اليكم من مقدمى عليكم فان قبلتم عذرى وصدقتم قولى واعطيتمونى النصف كنتم بذالك اسعد ولم يكن على سبيل -

وان لم تقبلوا منى العذر ولم تعطوا النصف من انفسكم فاجمعوا امركم وشركائكم ثم لايكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الى ولا تنظرون - ان ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين -

اما بعد فانسبونی فانظروا من انا ثم ارجعوا الی انفسکم وعاتبوها - فانظروا هل یحل لکم قتلی وانتهاك حرمتی ؟ الست ابن بنت نبیکم ؟ صلی الله علیه وسلم وابن وصیه وابن عمه واول المؤمنین بالله والمصدق لرسوله بماجاء به من عند ربه ؟ او لیس جمزة سید الشهداء عم ابی ؟ اولیس جعفر الشهید الطیار ذو الجناحین عمی ؟ اولم یبلغکم قول مستفیض فیکم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لی ولاخی هذان سیدا شباب اهل الجنة فان صدقتمونی بما اقول وهو الحق والله ما تعمدت کذبا من علمت الله یمقت علیه اهله ویضربه من اختلقه -

وان کذبتمونی فان فیکم من ان سألتموه عن ذالك اخبرکم - سلوا جابر بن عبد الله الانصاری وابا سعید الخدری او سهل بن سعد الساعدی او زید بن ارقم او انس بن مالك یخبروکم انهم سمعوا هذاه المقالة من رسول الله صلی الله علیه وسلم لی ولاخی - افما فی هذا حاجز عن سبك دمی ؟

فقال له شمر بن ذوالجوشن هو یعبد الله علی حرف ان کان یدری ماتقول فقال له حبیب بن مظاهر والله انی لاراك تعبد الله علی سبعین حرفا وانا اشهد انك صادق ماتدری ما یقول قد طبع الله علی قلبك -

ثم قال لهم الحسین : فان کنتم فی شك من هذا القول افتشکون اثرا ما انی ابن بنت نبیکم ؟ فو الله ما بین المشرق

والمغرب ابن بنت نبي غيرى منكم ولامن غيركم انا ابن بنت نبيكم خاصة -

اخبروني اتطلبوني بقتيل منكم قتلته ؟ او مال لكم استهلكته او بقصاص من جراحة -

قال (الراوى) فاخذوا لا يتكلمونه قال (الراوى) فنادى ياشيث بن ربعي وياحجاز بن ابجر وياقيس بن الاشعث ويايزيد بن الحارث ام تكتبوا الى ان قد اينعت الثمار واخضر الخياب طمت الجمام وانما تقدم على جند لك مجند فاقبل - قالوا له لم نفعل فقال سبحان الله بلى والله قد فعلتم -

ثم قال ايها الناس اذكرهتموني فدعوني انصرف عنكم الى مأمني من الارض -

قال له قيس بن الاشعث اولا تنزل على حكم بنى عمك فانهم لن يروك الاما تحب ولن يصل اليك منهم مكروه -

فقال له الحسين انت اخو اخيك اتريد ان يطلب بنوهاشم باكثر من دم مسلم بن عقيل - لاوالله لا اعطيهم بيدى اعطاء الذليل ولا اقر اقرار العبيد -

عباد الله انى عذت بربى وربكم ان ترجمون اعوذ بربى وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب -

ثم انه اناخ راحلته وامر عقبة بن سمعان فعقلها واقبلوا يزحفون نحوه (الطبرى ج٥ ص٢٤٣ س٢١ه)

"হে জনমণ্ডলী! আমার কথা শোন, আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কিছু করে বসো না। আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যা আমার কাছে তোমাদের প্রাপ্য আমাকে অবকাশ দাও, যাতে আমি কেন এখানে এলাম তার কারণ পেশ করতে পারি। তোমরা যদি আমার কারণ দর্শানোয় সন্তুষ্ট হও এবং আমার কথা বিশ্বাস কর, তাহলে আমার সাথে ন্যায়ানুগ ব্যবহার কর। তাতে তোমরাই ভাগ্যবান প্রমাণিত হবে। আমাকে অপরাধী করার কোন কারণ থাকবে না।

যদি আমার কৈফিয়ত তোমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় এবং তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার প্রতি ইনসাফ করতে না পার তাহলে তখন তোমরা তোমাদের করণীয় ব্যাপারে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেবে। তোমাদের সহকারীদেরকেও সাথে নেবে। তখন তোমাদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য অজানা থাকবে না। অতঃপর তোমরা আমার ব্যাপারে করণীয় যা করে ফেলবে। তখন আমাকে সময় দেবে না। আমার তত্ত্বাবধায়ক তিনি যিনি কুরআন নাযিল করেছেন। আর তিনিই সৎকর্মশীলদের তত্ব–বিধান করে থাকেন। তোমরা আমার বংশ পরিচয় নাও। দেখ আমিকে? তারপর বিবেচনা কর নিজেদের মনে। আর নিজেদেরকে তিরস্কার কর। বিবেচনা করে দেখ ,আমাকে হত্যা করাকি তোমাদের জন্য হালাল হবে? আমার পরিবারের ইজ্জৎ নষ্ট করা কি উচিৎ হবে? আমি কি তোমাদের নবীর কন্যার ছেলে নই? আল্লাহ তাঁর প্রতি করুনার্বষণ করুন। আমি কি তাঁর চাচাতো ভাইয়ের ছেলেনই? যিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি ইমান আনার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি। যিনি ছিলেন বিশ্বাস স্থাপনকারী আল্লাহর রাসুলের প্রতি এবং যা কিছু তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন সে সবের প্রতি। আর শহিদানের সরদার জনাব হামযা কি আমার চাচা নন? বেহেশতে বিচরণকারী শহীদ জাআফঅর কি আমার চাচা নন? তোমাদের কাছে কি সেকথা পৌঁছেনি যা সর্বজন বিদিত রাসলুল্লাহ সাল্লালাহ আলায়হিদ ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমাকে এবং আমার ভাই প্রসঙ্গে যে এরা উভয়ই বেহেশতের যুবকদের সর্বদার হবে। আমি যা বলছি সে ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে করবে। তাই হক। আল্লাহর কসম, যখন থেকে আমি অবগত হই যে আল্লাহ মিথ্যাবাদীর প্রতি অসন্তুষ্ট হন আর বানানো কথা মিথ্যাবাদীর ক্ষতিকরে, তখন থেকে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথা বলিনি।

যদি আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের নিকট জেনে নিতে পার । তাঁরা এ বিষয়ে তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন । তোমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী, আবু সাঈদ খুদরী--সাহল ইবনে সাআদ সাঈদী যায়েদ ইবন আরকাম, আনাস ইবন মালিককে প্রশ্ন করে জেনে নাও। তাঁরা বলবে যে তাঁরা এ কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট

শুনেছেন– তিনি আমার জন্য ও আমার ভাই–এর জন্য তা বলেছেন । এসব কিছু কি তোমাদেরকে আমার রক্তপাত হতে বিরত রাখার কারণ হবে না?

একথা শুনে শিমার ইবনু যুলজাউশান বলল, সে তো প্রান্তিক উপায়ে আল্লাহর ইবাদত করে। তুমি যা বলছ তা বোধগম্য নয়। শিমারের জবাবে হাবীব ইবনু মুযাহির বললেনঃ আল্লাহর কসম তুই ই সত্তর প্রান্তে আল্লাহর ইবাদতকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুই–ই সত্যবাদী যে তিনি যা বলেন তা তোর বোধগম্য নয়। আল্লাহ তোর অন্তরে সীলমোহর করে দিয়েছেন ।

এ বাক–বিতণ্ডা শেষে ইমাম হোসাইন তাদেরকে আরও বলেনঃ আমার পূর্বের কথায় তোমরা বিশ্বাস না আনলে তোমরাকি এ কথায় সন্দেহ পোষণ করবে যে আমি তোমাদের নবীর কন্যার সন্তান? আল্লাহর কসম, মাশরিক, মাগরিবে আমি ছাড়া আর কেউ তোমাদের নবীর নাতি নেই, তোমাদের মধ্যেও না, অন্যদের মাধ্যেও না, একমাত্র আমিই তোমাদের নবীর মেয়ের ছেলে।

আমাকে বলত, তোমাদের কারোর লোককে কি আমি মেরেফেলেছি যার বদলায় তোমরা আমাতে হত্যা করতে চাও? বা তোমাদের সম্পদ নষ্ট করেছি বলে আমাকে মেরে ফেলতে চাও? বা কাউকে আহত করেছি বলে তার প্রতিশোধ নিতে চাও?

বর্ণণাকারী বলেন, তখন সকলেই চুপ করে থাকে। কেউ কোন কথা বলেন নি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতপর ইমাম নাম ধরে ডাকেন ঃ ওহে শীস ইবনু রিবঈ! ওহে হাজ্জায ইবনু আবজার, ওহে কায়স ইবনু আশআস, ওহে যায়েদ ইবনু হাবিস! তোমরা কি আমার নিকট লেখনি যে, ফল পেকে গেছে -----সবুজ হয়েছে ----- আপনি একত্রিত প্রস্তুত সেনাদের মাঝে পদার্পন করবেন। তাই চলে আসুন। উত্তরে তাঁরা ইমাম হোসাইনকে বলেছিল ঃ আমরা এসব করিনি। তখন ইমাম বলেন ঃ আল্লাহর জন্য পবিত্রতা বণর্ণা করি। হ্যাঁ কসম আল্লাহর অবশ্যি তোমরা তা করেছ। তারপর তিনি বলেন ঃ ওহে লোকেরা! তোমরা যদি আমাকে না–ই চাও তবে আমাকে ছেড়ে দাও আমি তোমাদের কাছ থেকে চলে যাই আমার নিরাপদ স্থানে পৃথিবীর কোথাও ।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ কায়স ইবনু আশআস ইমামকে বলল ঃ আপনার চাচাতো ভাই (এজিদ) দের নির্দেশ মেনে আপনি কি আত্মসর্মপণ করতে পারেন না? তারা আপনি যা চান তার বাইরে আপনার সাথে ব্যবহার করবে না । তাদের তরফ হতে আপনার অনভিপ্রায় কিছু দেখতে পাবেন না ।

ইমাম হোসাইন তাকে বললেন ঃ তুমি তো তোমার ভাইয়ের ভাই–ই বটে (১) তুমি কি চাও যে বনু হাশিম মুসলিম ইবনু আকীলের রক্তের দাবীর বাইরে আর দাবী

করুক? আল্লাহর কসম, তা হবে না। আমি তাদের নিকট অপদস্তের ন্যায় হাত দেবনা। আর গোলামের মত হয়ে তাদেরকে স্বীকার করে নেবো না। আল্লাহর বান্দাগণ। আমি আমার রব ও তোমাদের রবের নিকট পানাহ চাই।' তোমরা আমার ব্যাপারে অমূলক ধারনা রাখবে না । আমি পানাহ চাই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যেক দাম্ভিক হতে যে হিসাব-নিকাশের দিনে বিশ্বাস রাখেনা।

অতপর ইমাম হোসাইন তার বাহনটিকে বসিয়ে দিলেন। তাঁর একান্ত সচিব উকবা ইবনু সামআনকে তা নিতে বললেন। উকরা তা বেধেঁ ফেললেন, আর শত্রুরা আক্রমণ আরম্ভ করে দিল[২]।

শহীদ ইমাম হোসাইনের এ ভাষণে প্রতিপক্ষের মুখোস খুলে যায়। কূফার বড় বড় নেতাদের নাম করে যখন তিনি কারবালায় ডাক দেন তখন তাদের মুনাফিকের মুখোশ খসে পড়ে। এরাই বেশী আগ্রহ করে ডেকে এনেছিল ইমাম হোসাইনকে। আর আজ এগিয়ে এল প্রতিপক্ষ সেজে। ইমাম হোসাইন যে আপোষকামী ছিলেন না, এজিদের হাতে বায়আত করার প্রস্তাব দেননি, কারবালার ভাষণে তা আয়নার মত পরিষ্কার প্রতিভাত হয়। এখানে তিনি বলেছেন তিনি গোলামের মতো আনুগত্য স্বীকার করবেন না। তাদের হাতে অপদস্তের ন্যায় হাত রেখে বশ্যতা স্বীকার করবেন না।

ইমাম হোসাইনকে যারা শহীদ করেছে আখিরাতেতাদের হাতে পেশ করার মাতো কোন অজুহাত তিনি থাকতে দেননি । তিনি প্রশ্ন রাখেন তাদের কোনো লোককে কি তিনি হত্যা করেছেন? তাদেরকে তিনি আঘাত করে আহত করেছেন? তাদের কোন সম্পদ নষ্ট করেছেন? এসব প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক। যেসব কারণে একজন লোকলে সাধারণত লোকেরা অপরাধী মনে করে থাকে তার কোনটাই ইমাম হোসাইন করেননি। রইল বিদ্রোহের কথা। ইমাম হোসাইন বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামের হাদীস মতে, শাসকরা যখন 'সুলতান জাইর (জালিম) বনে যায়। জুলুম অত্যাচার শুরু করে। বাইতুলমালকে লুটের মালে পরিণত করে। হালাল-হারামের তমিজ করে না।। হুদুদুল্লাহ কায়েম করবেনা তখন রাষ্ট্র শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ফরজ হয়ে যায়। এ অভিযোগ বার বার ইমাম উথাপন করেছেন। কেউএর প্রতিবাদ করেনি। এমতাবস্থায় আমর বিল মারূপ ও নাহি আনিল মুনকার করা ফরয ছিল। তা না করলে জাহান্নামে যেতে হবে বলে হাদীসটিতে উল্লেখ রয়েছে। কাজেই এজিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তখন ফরয ছিল বিধায় তা বাগওয়াত বা বৈধ ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল না। তখন পর্যন্ত এজিদের হাতে 'বায়আতে আম্মাহ' অনুষ্ঠিত হয়নি। আমীর মুআবিয়া বল প্রয়োগে বশংবদের দ্বারা

আগাম বায়আতের অবৈধ বেদআতী পন্থায় এজিদকে মসনদে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন, যা তার আমলেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। কাজেই প্রতিপক্ষের হাতে উপস্থিত করার মতো কোন অজুহাত থাকার উপায় তিনি তাঁর ভাষণে রাখেননি। আর রোজ হাশরেতো এজিদী কর্মকাণ্ডের যাবতীয় গোপনীয় তৎপরতা ধারা পড়ে যাবেই। তখন জান্নাতের সরদার ইমাম হোসাইনের মোকাবিলায় কিছুই বলার থাকবে না।

সূত্র সূচী ১৭২

১· মুহাম্মাদ ইবনু আশআস হযরত আকীলকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু ইবনু যিয়াদ এ আশ্রয় (আমন) প্রত্যাহার করে তাঁকে হত্যা করে ফেলে। কায়েস ইবনু আশআস ইমাম হোসাইনকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। তাই ইমাম উক্তরূপ মন্তব্য করেন। শহীদে কারবালা ঃ মুফুতা শফী ঃ ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২· তাবারী ঃ ৫ম খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা ৬১ হিজরী সাল।

৩·

এজিদী চরিত্রের ক্ষমতা দখলের পরিণতি

ইমাম হোসাইন বলেন ঃ

وعلى الاسلام السلام اذ قدبليت الامة براع مثل يزيد -
(الامام حسين)

"ইসলামের বিদায় কারণ এজিদের ন্যায় ব্যক্তিকে শাসক নিযুক্ত করে উম্মতকে বিপদে ফেলা হয়েছে—"

'ইমাম হোসাইন'

(الكامل لابن الاثير ج٢ ص١٢)

হযরত ইমাম হোসাইন কি এজিদের হাতে বায়আত করতে চেয়েছিলেন?

ইমাম হোসাইনের জীবন চরিত আলোচনায় একটি প্রশ্ন প্রকট হয়ে দেখা দেয়া। তিনি কি এজিদের হাতে হাত রেখে আপোশ করতে চেয়েছিলেন? যদি তাই হবে তাহলে এজিদের বিরুদ্ধে এ সংগ্রামের নৈতিক ভিত্তি কি? না তিনি ভীত ছিলেন না। এজিদের হাতে বায়আত করে তার সাথে আপোশ করার প্রস্তাব তিনি দেননি।

হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) শহীদ হওয়ার পূর্ব রাতে তন্দ্রাবস্তায় শুনতে পান যে এক অশ্বারোহী বলছে, মানুষগুলো মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে আর মৃত্যু এদের দিকে– এ খাব দেখে ইমাম হোসাইন উঁচু স্বরে– ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন–বলে উঠলেন। হযরত আলী ইবনে হোসাইন এ আওয়াজ শুনতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন আব্বু এভাবে ইন্নালিল্লাহ উঁচু স্বরে বললেন কেন? ইমাম হোসাইন বিষয়টি খুলে বলেন। তখন আলী ইবনে হুসাইন বললেন ঃ

قال له يابت لا اراك الله سوأ - السنا على الحق ؟ قال بلى والذى اليه مرجع العباد - قال يابت اذا لانبالى نموت محقين فقال له جزاك الله من ولد خير ما جزى ولد عن والده -

(الطبرى ج٥ ص٢٣٢، ٢١هـ)

হে পিতা! আল্লাহ যেন আপনাকে মন্দ দিন না দেখান। আমরা কি ন্যায়ের উপর সংগ্রাম করছি না? হযরত ইমাম হোসাইন বললেনঃ অবশ্যই যার নিকট সকল বান্দাকে ফিরে যেতে হবে তার কসম করে বলছি। আলী ইবনে হুসাইন বললেন ঃ হে পিতা তাহলে হকের উপর থেকে ন্যায়পন্থীরূপে মৃত্যুবরণ করতে আমরা মোটেই কুণ্ঠিত নই। ছেলের এ উত্তর শুনে ইমাম হোসাইন বলে উঠলেনঃ পিতার পক্ষে উত্তম সন্তানকে আল্লাহ যতো উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন তোমাকে যেন আল্লাহ অনুরূপ প্রতিদান প্রদান করেন।" (তাবারী ৫ম খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা, ৬০ হিজরী)

কারবালা ময়দানে উপনীত হওয়ার পূর্ব দিবসে হুর ইবনে এজিদ ইমাম হোসাইনকে নির্ঘাত মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে এজিদের হাতে বায়আত গ্রহণের কথা বলে। উত্তরে ইমাম হোসাইন আত্মসমর্পণে অসম্মতি জানিয়ে বলেন ঃ

فقال له الحسين افبالموت تخوفنى ؟ وهل يعدوبكم الخطب ان تقتلونى ؟ مادرى ما اقول لكم : ولكن اقول كما قال اخو الدوس لابن عمه ولقيه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اين تذهب ؟ فانك مقتول - فقال :

سأمضى ومابالموت عارعلى الفتى

اذا مانوى حقا وجاهد مسلما

وآسى الرجال الصالحين بنفسه

وفارق مثبورا يغش ويرغما -

তখন হোসাইন হুর ইবনে এজিদকে বললেনঃ আমাকে তুমি মৃত্যুর ভয় দেখাও? আর সংকট কি তোমাদেরকে আমাকে কতল করার প্রতি প্রলুব্ধ করবে? তোমাদেরকে কি বলব তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে তাই বলব যা দউস গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেছিল তার চাচাতো ভ্রাতার উদ্দেশ্যে। তার চাচাতো ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করার জন্য যাচ্ছিল। তাকে লক্ষ্য করে তার চাচাতো ভাই দউসী বললঃ কোথায় যাচ্ছ? তুমিতো নির্ঘাত মারা পড়বে। তাকে উত্তর দিতে গিয়ে সাহায্য করতে অগ্রসরমান দউসী লোকটি বলেছিলঃ আমি যাবই। সৎ সাহসী যুবকের জন্যে মৃত্যুতে গ্লানি নেই যদি সে ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়, একজন মুসলমানের দায়িত্ব পালনে জিহাদ করে যায়, নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে সৎলোকদের প্রতি সহানুভূতি জানায় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ধোঁকাবাজ অপদস্ত ব্যক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (তাবারীঃ ৫ খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা, ৬১ হিজরী প্রসঙ্গ)

এখানে পরিষ্কার বলা যায় যে, ইমাম হোসাইন (আঃ) রাসূলের দ্বীনের সাহায্যকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ সংগ্রামে তার প্রাণ সংহার করা হলেও তিনি গ্লানি অনুভব করবেননা। যে কোন মর্যাদাবান ব্যক্তির জন্য ন্যায়ের পথে কুরবান হয়ে যাওয়া গ্লানির বিষয় নয়। ইমাম হোসাইন আপোশের পথে নাগিয়ে সংগ্রামের পথ ধরছিলেন। এজিদের হাতে বায়আত করার প্রস্তাবে রাযী হননি।

আত্মসমর্পণের আহবান জানিয়ে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পত্র ঃ

ইতিপূর্বে ইমাম হোসাইনকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য এজিদ বাহিনীর প্রতি উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের পক্ষ হতে জোর তাগিদ দিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। তার পত্রটি আমরা পত্রস্থ করলাম। পত্রটি এজিদ বাহিনীর সেনানায়ক উমর ইবনে সা'আদের নামে পাঠানো হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد بلغنى كتابك وفهمت ماذكرت فاعرض على الحسين ان يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع اصحابه فاذا فعل ذالك رأينا رآينا - والسلام - (الطبرى ٥ ص٢٣٤، ٦١هـ)

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, অতঃপর তোমার পত্র পেয়েছি। তুমি যা বলেছ তা বুঝতে পেরেছি। অতএব হোসাইনের কাছে প্রস্তাব দাও, তিনি যেন মুআবিয়ার পুত্র এজিদের পক্ষে বায়আত করেন। তার এবং তার সকল সঙ্গী সাথীদের বায়আত করতে হবে। তিনি তা করলে পরে আমাদের যা করার তা আমরা করব। ইতি।"

(তাবারী ঃ ৫ খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, ৬১ হিজরী প্রসঙ্গ)

পানি বন্ধ করার নির্দেশ ঃ

এ পত্র মতে উমর ইবনে সা'আদ হযরত ইমাম হোসাইনকে এজিদের পক্ষে বায়আত করতে বলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ সংবাদ পৌছানোর পর উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ পানি বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ জারি করে। হোসাইনী কাফেলার জন্য পানি বন্ধের নির্দেশ দিয়ে দুরাচার ইবনে যিয়াদ তার পত্রে বলে ঃ

اما بعد فحل بين الحسين واصحابه وبين الماء - ولايذوقوا منه قطرة كما صنع بالتقى الزكى المظلوم امير المؤمنين عثمان بن عفان - (الطبرى ج٥ ص٢٣٤، ٢١هـ)

"অতপর হোসাইন ও হোসাইনের সাথীদের পানি বন্ধ করে দাও। তারা যেন এক ফোঁটা পানিও পান করতে না পারে- যেমনটি করেছে মুত্তাকী, পবিত্র, মজলুম, আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফ্ফানের সাথে।

(তাবারীঃ ৫ খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা, ৬১ হিঃ প্রসঙ্গ)

বলা বাহুল্য, ইমাম হোসাইন বা আলে রাসূলের কেউ হযরত উস্মানের পানিবন্ধ করেনি। বরং তাঁরাই ঝুঁকি নিয়ে হযরত উসমানের অবরুদ্ধ ঘরে পানি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। এজন্য বিদ্রোহীদের সাথে সংঘর্ষও বেঁধে যায়। ইমাম হোসাইন এ সংঘর্সে আঘাতও পেয়েছিলেন। তখন যিয়াদদের বংশধর কেউ এগিয়ে আসেনি। এমনকি আমীর মুআবিয়া পরিস্থিতির ভয়াবহতা জেনেও অগ্রসর হয়ে এসে হযরত উসমানকে রক্ষা করেননি। সে বিবরণ অতি করুণ। কাজেই হযরত উসমান (রাঃ) এর পানি অবরোধের অভিযোগ ইমাম হোসাইনের প্রতি চরম মিথ্যারোপ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপবাদ মাত্র।

যাই হোক, হযরত হোসাইনের পানি বন্ধ করে দেয়ার চরম নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও ইমাম হোসাইন এজিদের প্রতি বায়আত করতে রাযী হননি।

এক পর্যায়ে এজিদ বাহিনীতে যোগদানকারী বিশ্বাসঘাতক কায়স ইবনে আশআস ইমাম হোসাইনকে বলে যে আপনি কি আপনার চাচাতো ভাই এর হুকুমের প্রতি আস্থা রেখে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না? তারা আপনার সাথে কোন অপ্রত্যাশিত অন্যায় আচরণ করবে না ঃ

(اولاتنزل على حكم بنى عمك ؟ فانهم لن يروك الاما تحب ولن يصل اليك منهم مكروه)

এ প্রস্তাবের উত্তরে ইমাম হোসাইন (আঃ) অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলেনঃ

لا والله لا اعطهم بيدى اعطاء الذليل ولا اقر اقرار العبيد عباد الله انى عذت بربى وربكم ان ترجمون -

"আল্লাহর কসম আমি তাদের নিকট অপদস্থ ব্যক্তির ন্যায় হাত রেখে দিতে পারি না। আর দাসদের মত তাদেরকে স্বীকৃতি দিতে পারি না। আল্লাহর বান্দারা তোমরা আমার ব্যাপারে অমূলক ধারণা নিবে আমি এ বিষয়ে আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

(তাবারী ঃ ৫ম খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, ৬১ হিজরী প্রসঙ্গ))

কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে ইমাম হোসাইনের অন্তিম ভাষণের এটা ছিল অংশ বিশেষ। এখানেও তিনি এজিদের প্রতি আত্মসমর্পণ বা তার হাতে হাত রেখে অনুগত হওয়ার প্রস্তাব বাতিল করেছেন।

এজিদের প্রতি বায়আত বা ইমাম হোসাইনের আত্মসমর্পণের অমূলক কাহিনীর ইতি টানতে গিয়ে আমরা উতবা ইবনে সামআন এর চূড়ান্ত মন্তব্য এখানে উপস্থিত করতে চাই। ইবনে সামআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ

عن عتبة بن سمعان قال : صحبت حسينا فخرجت معه من المدينة الى مكة ومن مكة الى العراق ولم افارقه حتى قتل - وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولابمكة ولا بالعراق ولا فى عسكر الى يوم مقتله الا وقد سمعتها - الا والله ما اعطاهم مايتذاكر الناس وما يزعمون من ان يضع يده فى يد يزيد بن معاوية ولا ان يسيروه الى ثغر من ثغور المسلمين ولكنه قال : دعونى فلاذهب فى هذه الارض العريضة حتى ننظر مايصير امر الناس - (الطبرى ج٥ ص٢٣٥، ٢١هـ)

"উতবা ইবনে সামআন বলেন ঃ আমি ইমাম হোসাইনের সঙ্গে ছিলাম। আমি মদীনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে মক্কা হতে ইরাকে যাত্রাপথে সাথেই ছিলাম। শেষ পর্যন্ত তাঁর শাহাদাত বরণের সময়ও আমি তাঁর নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হইনি। তিনি মদীনায়, মক্কায়, ইরাকে এবং সেনাবাহিনীর সামনে তাঁর শহীদ হওয়া পর্যন্ত যেখানে যে বক্তব্যই রেখেছেন আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী, তা আমি সরাসরি শুনেছি। আল্লাহর কসম! লোকেরা যা বলে সে মতে ইমাম হোসাইন শত্রুদেরকে তাদের দাবী অনুসারে

হক প্রতিষ্ঠায় মুমিনের কর্তব্য

الاترون ان الحق لايعمل به وان الباطل لايتناهى عنه
ليرغب المؤمن فى لقاء الله محقا -

(امام حسين)

—"তোমরা কি লক্ষ্য কর না ঃ হকের উপর আমলকরা হচ্ছে না। বাতিল কর্ম হতে বিরত রাখা হচ্ছে না। মুমিনের কর্তব্য হল হক অনুসরণকারী রূপে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

—'ইমাম হোসাইন'

مقتل الحسين للخوارزمى ج٢ ص٥ -

কূফাবাসীদের সামনে যোহাইর ইবনু কাইনের ভাষণ ঃ

"ওহে কুফাবাসী! আল্লাহর আযাবকে ভয় করার জন্য তোমাদেরকে সাবধান করছি। আল্লাহকে ভয় কর। একজন মুসলমানের উচিত অপর মুসলমান ভাইকে নসীহত করা। আমরা এখন পর্যন্ত ভাই ভাই। একই দ্বীনে বিশ্বাসী। একই মিল্লাতের অন্তর্ভূক্ত। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে তরবারি উত্তোলিত না হবে তখন এরূপ থাকবে। তোমরা আমাদের নিকট হতে নসীহত পাওয়ার দাবী রাখ। যখন তলোয়ার উত্তোলিত হবে নিরাপত্তা দুরিভূত হয়ে যাবে। তোমরা ও আমরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উভয়কে তাঁর নবী মুহাম্মাদের (সঃ) বংশধরদের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলেছেন। তিনি দেখতে চান আমরা এবং তোমরা এ ব্যাপারে কি আচরণ করি, আমি তোমাদেরকে নবী পরিবারের পক্ষে এসে তাঁদেরকে সাহায্য করার জন্য ডাকছি। আর চরম বিদ্বেষপোষণকারী উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের পক্ষ সমর্থন ত্যাগ করতে বলছি। নিশ্চয় তোমরা উবায়দুল্লাহ এবং যিয়াদের আমলে উভয়ের জীবনে মন্দ ছাড়া ভাল পাওনি। তারা তোমাদের চোখে উত্তপ্ত লোহার সলাকা প্রবেশ করিয়ে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়। তোমাদের হস্ত ও পদ কর্তন করে। তোমাদের কর্ণ নাসিকা কেটে ফেলে মুসলা[১] করে।

তারা খেজুর বৃক্ষের কান্ডে তোমাদেরকে শূলিতে চরায়। তোমাদের শীর্ষ স্থানীয় অনুকরণীয় মহান ব্যক্তিদেরকে হত্যা করে। তোমাদের শিক্ষক বৃন্দকে জবাই করে। হুজুর ইবনু আদী এবং তাঁর সঙ্গীসাথী, হানী ইবনু উরওয়া এর ন্যায় ব্যক্তিবর্গকে তারা হত্যা করেছে।"

কুফার এজিদী সেনারা যোহাইরের ভাষণ শুনে তাঁকে গালাগালি করা আরম্ভ করে দেয়। তারা উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের প্রসংসা করে। তার মঙ্গল কামনা করে। তারা বলে ঃ আল্লাহর কসম, আমরা তোমার নেতাকে আর যারা তার সাথে রয়েছে তাদেরকে হত্যা করব। অথবা তাদেরকে গ্রেফতার করে সোজা আমীর উবায়দুল্লাহ সকাশে পাঠাব।

একথা শুনে যোহাইর তাদেরকে বলেন ঃ আল্লাহর বান্দারা! নিশ্চয় ফাতিমা তনয় ইমাম হোসাইন সুমাইয়ার ছেলে উবায়দুল্লাহ অপেক্ষা ভালবাসা পাওয়ার এবং সাহায্য পাওয়ার বেশী হকদার। তোমরা যদি তাঁকে সাহায্য করতে রাযী না হও তবে তাঁকে হত্যা করো না।

হুর ইবনু এজিদ এখন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি দ্বীনের সৈনিকে পরিণত হন। ছিলেন কিন্তু তাগূতী সেনা। ইসলামী হুকুমত পন্থীরা অগ্রসর হলে তাগুতের শিবির হতে বহু নিষ্ঠাবান 'হুর' জিহাদে অনুপ্রাণিত হয়ে চলে আসবেন। আসছেনও বটে। পেছনে তিনি সহযাত্রী ছেড়ে এসেছিলেন। তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। তাদেরকে বুঝানোর জন্য যোহাইর ইবনু কাইন এর ন্যায় ভাষন দিতে যান। অবশ্য তিনিও প্রত্যাখ্যাত হন। তবু তাবলীগের দায়িত্ব পালিত হয়।

হুর ইবন এজিদের ভাষণ

হুর ইবনু এজিদ দুঃখ মিশ্রিত ক্ষোভ নিয়ে কূফাবাসীদের প্রতি অগ্রসর হন। তিনি ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের মেজাজ ছিল সৈনিক সুলভ। তিনি এজিদ সেনাদের কার্যকলাপ নিজ চোখে দেখে এসেছিলেন। তাদের অভিপ্রায় অবগত ছিলেন। তিনি ভাষণটিতে তাঁর জানা তথ্য উদ্‌ঘাটন করে দেন। তিনি বলেন ঃ

يا اهل الكوفة لامكم الهبل والعبر اذ دعوتموه حتى اذا اتاكم اسلمتموه وزعمتم انكم قاتلوا انفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه امسكتم بنفسه واخذتم بكظمه واحطتم به من كل جانب فمنعتموه التوجه فى بلاد الله العريضة حتى يأمن ويأمن اهل بيته - واصبح فى ايديكم كالاسير لا يملك لنفسه نفعاً ولايدفع ضراً وخلئتموه ونساءه واصيبته واصحابه عن ماء الفرات الجارى الذى يشرب به اليهود والمجوسى والنصرانى وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه -

وهاهم صرعهم العطش بئس ماخلفتم محمدا فى ذريته لاسقاكم الله يوم الظمأ ان لم تتوبوا وتنزعوا عما انتم عليه من يومكم هذا فى ساعتكم هذه -

فحملت عليه رجالة لهم ترميه بالنبل فاقبل حتى وقف امام الامام (الطبرى ج٥ ص٤٤٥، ٢١هـ)

"ওহে কূফাবাসীরা! তোমাদের মায়েরা তোমাদের প্রতি কাঁদুক শোক করুক! কেননা তোমরা তাঁকে (হোসাইনকে) ডেকে এনেছ! যখন তিনি এসে গেলেন তোমাদের নিকট তখন তোমরা তাঁকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়েছ। তোমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল, তোমরা তাঁকে রক্ষা করার নিমিত্ত লড়াই করবে। অতঃপর তোমরাই তাঁর উপর চড়াও হয়ে আসলে তাঁকে হত্যা করার জন্য। তাঁকে তোমরা ধরে রাখলে, তাঁর ধৈর্য নিয়ে টানাটানি করলে, আর চারদিক দিয়ে তাকে ঘেরাও করে ফেললে। তাঁকে আল্লাহর প্রশস্ত ভূমিতে বিচরণ করতে দিলে না। যাতে তিনি এবং তাঁর পরিবার নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারেন। তিনি তোমাদের হাতে বন্দী হয়ে রইলেন। নিজের জন্য কিছুই করতে পারছেন না। নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন না। তাঁর জন্য, তাঁর পরিবারের মহিলাদের জন্য, তাঁর ছোট ছোট শিশু-সন্তানদের জন্য তোমরা বন্দ করে দিয়েছো ফুরাতের প্রবাহমান ধারা। ইহুদীরা অগ্নি পূজা করা, খৃষ্টানরা ফুরোতের পানি পান করে। আর ফুরাতের পানিতে কৃষ্ণকায় মানুষের কুকুরগুলো অবগাহন করে লুটোপুটি খায়।

ওই দেখ, নবী পরিবারকে তৃষ্ণা কাতর করে ফেলেছে। তারা দাঁড়াতে পারছে না। তোমরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আচরণ করছ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সাথে তার দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার পর। আল্লাহ তা'য়ালা পিপাসার দিন (হাশরের দিন) তোমাদেরকে পানি পান করাবেন না যদি তোমরা এখনি তাওবা না কর এবং যে জুলুম চালিয়ে যাচ্ছ আজই এ মুহূর্তেই তা বন্ধ না কর।"

এ পর্যন্ত হুর ভাষণ দিলে শত্রুদের পদাতিক বাহিনী তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তার ওপর হামলা চালায়। তিনি ফিরে এসে ইমাম হোসাইনের সামনে দাঁড়িয়ে যান।[৫]

হুর ইবনু এজিদের ভাষণটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। এ ভাষণে কূফাবাসীদের হৃদয়হীন কার্যকলাপের চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠে। ডেকে এনে মেহমানের সাথে এরূপ আচরণ নিকৃষ্ট লোকেরাই করতে পারে। কারোর পানি পান করার অধিকার কেড়ে নেয়া কত বড় গর্হিত কর্ম তা ভাবা যায় না। তাও আবার নবী পরিবারের লোকদের সাথে এ অমানুষিক আচরণ? ঠিকই বলেছেন হুর ইবনু এজিদ! এহেন নরাধমরা হাশরের ময়দানের সেই কঠিন দিনে পানি পাবে না। তখন তারা বুক ফেটে কাঁদতে থাকবে। কিন্তু এক ফোঁটা পানি খেতে পাবে না।

কারবালার অসম যুদ্ধে বীভৎস হত্যাকাণ্ড

এক পক্ষে ৭০ কি ৭২ জন লোক। অপর পক্ষে রয়েছে পাঁচ হাজার সৈন্য। মতান্তরে আরও অধিক। এটাকে কোন অর্থে যুদ্ধ বলা যায় না। বলা যায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষের হত্যাকাণ্ড। সংখ্যায় যাঁরা কম ছিলেন তাঁদের পক্ষ হতে যুদ্ধের সূচনাও করা হয়নি। মহররম এর দশ তারিখ ফজরের নামাজের পরই শত্রু পক্ষ অবিলম্বে সেনা সমাবেশ করে। এজিদ পক্ষের সেনা নায়ক শিমার ইবনু যুল জাউশান ইমাম হোসাইনের অবস্থানদেখে নেয়ার জন্য ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে ইমামের তাঁবুর সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখে যায়। সে যখন ফিরছিল তখন তীর মেরে তাকে হত্যা করে ফেলার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন মুসলিম ইবনু আউসাজাহ (রাঃ)। মুসলিম ইবনু আউসা বলেন ঃ

فقال له مسلم بن عوسجة يا ابن رسول الله جعلت فداك الارميه بسهم فانه قد امكننى وليس يسقط سهم فالفاسق من اعظم الجبارين فقال له الحسين لاترمه فانى اكره ان ابدآهم - (الطبرى ج٥ ص٣٤٢، ٢١هـ)

"হে রাসূলের নাতি! আমি আপনার জন্য কুরবান! আমি কি একে তীর মেরে হত্যা করব না" সে আমার আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে। তীর ব্যর্থ যাবে না। এ ফাসিক লোকটি জঘণ্য প্রকৃতির জালিম। ইমাম হোসাইন তাঁকে বললেন ঃ তাকে তীর মেরো না। আমি সর্ব প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করতে পছন্দ করি না।[১] ইমাম হোসাইনের পক্ষ হতে যুদ্ধ আরম্ভ করার আগ্রহ না দেখে এজিদ বাহিনীর সেনাপতি উমর ইবনু সা'দ তার দাস যুওয়াইদকে বলল ঃ যোওয়াইদ তোর তীরের থলিটি আন। যোওয়াইদ তীরের থলি এগিয়ে দিল। আর উমর ইবনু সা'দ একটি তীর উঠিয়ে নিয়ে ধনুকে স্থাপন করল। অতঃপর তীর নিক্ষেপ করে বলল, তোমরা সাক্ষ্য থেকো। আমি সর্ব প্রথম তীর মেরে যুদ্ধের সূচনা করলাম। ২

ثم رمى فقال اشهدوا انى اول من رمى (الطبرى ج٥ ٤٤٥هـ)

কাজেই কারবালার যুদ্ধকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ বলা হবে। তাও চাপিয়ে দেয়া অসম যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইমাম হোসাইনের পক্ষ অগ্রগামী ছিলেন। আর এজিদ বাহিনী মার খাচ্ছিল। পরে উমর ইবনু সা'দ এ অবস্থা দেখে এক সঙ্গে সকলে মিলে আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়। বিক্ষিপ্ত হামলা বন্ধ করতে বলে। তাই তারা করে। ইমাম পক্ষ পিছ

পা না হয়ে সম্মুখ সমরে এগিয়ে চলেন। কিন্তু কাহাঁতর। হাজার হাজার সেনাদের বিরুদ্ধে কি ৭০ জন প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়সের লোকেরা যুদ্ধ জয় করতে পারে? ফলে যা হবার ছিল তাই হল। ইমাম তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে কারবালায় শাহাদাত বরণ করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের হাল—হাকিকত

ইমামের সাথে বেআদবীর পরিণাম

তামীম গোত্রের আব্দুল্লাহ ইবনু হাউযা নামক এক ব্যক্তি ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে ইমাম হোসাইনের খুঁজে আসে। ও হোসাইন! ও হোসাইন বলে চিল্লায়। ইমাম হোসাইন বলেন, কি চাও? লোকটি বলে ঃ দোযখের সুসংবাদ নাও। ইমাম হোসাইন বলেন ঃ كلا انى اقدم على رب رحيم شفيع مطاع "মোটেই না, আমিতো দয়ালু প্রতিপালক এবং বাধ্য শাফাআতকারীর নিকট যাচ্ছি।[১] পরে ইমাম হোসাইন বলেন ঃ

من هذا লোকটি কে? সাথীরা বললেন ঃ ইবনু হাউযা। ইমাম হোসাইন বদদোওয়া করেন رب حزه الى النار ওহে আমার প্রতিপালক! তাকে দোযখে স্থানান্তরিত কর।" বর্ণনাকারী বলেন ঃ তার ঘোড়া তাকে নিয়ে খালের মধ্যে পড়ে তার আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। সে নিচে পড়ে যায়। আর তার বাম পা রেকাবীতে আটকে থাকে। ঘোড়া দৌড়াতে থাকে। আর তার মাথা পাথরের সাথে বাড়ি খেতে খেতে মগজ বেরিয়েযায়।[৩] এভাবে যুদ্ধের শুরুতেই লোকটি জাহান্নামে চলে যায়। বেআদবীর এটাই পরিণাম।

হানযালা ইবনু আসআদ—এর শাহাদাত

কারবালার অসমযুদ্ধ যাত্রার অর্থ ছিল নিশ্চিত শাহাদাত বরণ। ইমাম হোসাইনের পক্ষ হতে যে ব্যক্তিই যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করতো শত্রু সেনা নিহত করার পর সে নিজেও শহীদ হয়ে যেতো। ফিরে আসতো না। তাই যুদ্ধে গমনের পূর্বে শেষবারের মত ইমামকে সালাম জানিয়ে তাঁরা ময়দানে প্রবেশ করতেন। ইমাম হোসাইন তাঁর তাঁবুর সামনে বসে যুদ্ধ গমনেচ্ছু সৈনিকদের সালাম গ্রহণ করতেন। আর শেষ দেখা দিতেন। জান কবুল সাথীরা ইমামের নূরানী চেহারা দর্শনে তৃপ্ত হয়ে বেহেস্তের পথে পা

বাড়াতেন। বহু মুজাহিদ এরূপে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে নবী বংশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেলেন শেষবারের মতো। এবার আগমন হলো নবী বংশের প্রেমিক হানযালা ইবনু আসআদ শুব্বামীর। তিনি ইমাম হোসাইনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সামনে শত্রু সেনাদের বিরাট বাহিনী। তাদেরকে লক্ষ্য করে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করে কুরআনের ভাষায় নসীহত করতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ

فاخذ ينادى ياقوم انى اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعد هم ومالله يريد ظلما للعباد وياقوم انى اخاف عليكم يوم التناد تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد - ياقوم لاتقتلوا حسينا فيسحتكم الله بعذاب وقدخاب من افترى -

فقال له حسين يابن اسعد رحمك الله انهم استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم اليه من الحق ونهضوا اليك ليتهجوك واصحابك فكيف بهم الان وقد قتلوا اخوانك الصالحين قال صدقت جعلت فداك انت افقه منى واحق بذالك - افلاتروح الى الآخرة ونلحق باخواننا ؟فقال رح الى خير من الدينا وما فيها والى ملك لايبلى فقال السلام عليك اباعبد الله صلى الله عليك وعلى اهل بيتك وعرف بيننا وبينك فى جنته فقال آمين آمين فاستقدم فقاتل حتى قتل -

(الطبرى ج٥ ص٢٥٤)

"অতঃপর তিনি উঁচু আওয়ায করে ডাকলেন ঃ ওহে আমার সম্প্রদায়! আমি ভয় করি তোমাদের প্রতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর আযাব আসার সদৃশ দিবসের যেমন অবস্থা হয়েছিল নূহের জাতির। আদ সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের। বস্তুতঃ আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুম করার ইচ্ছা রাখেন না। ওহে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য ভয় করি আর্তনাদ দিবসের যেদিন তোমরা পেছনে দৌড়াবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। তোমাদের জন্য আল্লাহর হাত হতে কোন রক্ষাকারী থাকবে না। আর যাকে আল্লাহ পথ হারা করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।"

"ওহে আমার জাতি! তোমরা হোসাইনকে কতল কর না। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। আর যারা মিথ্যা দোষারোপ করে তারা সফলকাম হয় না।

এ পর্যন্ত ভাষণ দিলে ইমাম হোসাইন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ওহে আসআদ তনয়! আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত করুন। এরাতো তখনই নিজেদের জন্য আযাব অবধারিত করে নিয়েছে, যখনই এরা তোমার হকের আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তোমার ও তোমার সাথীদের রক্তপাত বৈধ মনে করে তোমার মুকাবিলায় এসেছে। কাজেই এদের ব্যাপারে এখন আর কি হবে? অথচ তারা তোমাদের নেক ভাইদেরকে হত্যা করেছে। হানযালা ইবনু আসআদ বলেন ঃ সত্যি বলছেন, আপনার প্রতি আমার প্রান উৎসর্গীত হোক। আপনি বিষয়টি আমার চেয়ে ভাল বুঝেন। আর এ বিষয়ে আপনি অগ্রগণ্য। আমরা কি আখিরাতের দিকে রওয়ানা হব না? আর আমাদের ভাইদের সাথে গিয়ে মিলিত হব না? ইমাম হোসাইন বললেন ঃ রওয়ানা হও দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত যাবতীয় বস্তু হতে উত্তম প্রাপ্যের দিকে। আর অক্ষয় রাজ্যের দিকে। তখন হানযালা ইবনু আসআদ বললেন ঃ সালাম আপনার প্রতি হে আবু আব্দুল্লাহ! শান্তি হোক আপনার পরিবারের প্রতি। আল্লাহ যেন আমাদের এবং আপনাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন বেহেশতে। উত্তরে ইমাম হোসাইন বলেন ঃ আমীন-আমীন। অপঃপর হানযালা যুদ্ধের ময়দানের দিকে চলে গেলেন। তিনি শহীদ হওয়ার সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করে যান।

দু'জন জাবিরী যুবকের যুদ্ধযাত্রা

জনাব হানযালা (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণের পর মুহূর্তে দু'জন জাবিরী বংশের যুবক ময়দানে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হয়ে আসেন। তাঁরা এসে ইমাম হোসাইনের সাথে দেখা করেন। সে কি করুণ দৃশ্য! তাঁরা এসে ইমাম হোসাইন (আঃ)কে সালাম করেন। সালাম আপনার প্রতি ওহে রাসূলুল্লাহর নাতী! ইমাম হোসাইন উত্তরে বললেন ঃ ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ-- তোমাদের প্রতিও শান্তি ও আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। তারা উভয় যুবক যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। এ যেন ইমাম হোসাইন সবাইকে হাতে ধরে বেহেশতে পাঠাচ্ছিলেন।

আবেস ইবনু শাবীব ও শাওযাবের আগমন

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবেস ইবনু শাবীব শাকিরী ও শাওযাব উপস্থিত হন। শাওয়াব ছিলেন শাকিরীর মুক্তদাস। শাকিরী শাওযাবকে বললে ياشوذب ما فى نفسك ان تصنع শাওযার! তোমার বাসনা কী? শাওযার বললেন : কি আর করব, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নাতিকে রক্ষা করার জন্য আপনার সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করব যতক্ষণ আমার জীবন থাকে এবং আমি শহীদ না হই। শাকিরী বললেন : তোমার ব্যাপারে আমি এ ধারনাই পোষণ করি। তাই হোক। প্রথমে আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম হোসাইন)–এর নিকট গমন কর। যাতে তিনি তোমাকে নেকী লাভের জন্য গ্রহণ করেন। যেরূপ তোমার অন্যান্য সাথীদেরকে গ্রহণ করেছেন। আর আমিও যেন তোমাকে নেকী লাভের জন্য গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে এখন যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ তোমার চেয়ে উত্তম আমার সঙ্গে থাকত সে যদি আমার সামনে আসত তাহলে তাকে আমি খুশী মনে নেকী লাভের জন্য গ্রহণ করতাম। কারণ আজ এমন দিন যেদিনে আমাদের নেকীর আশা করা প্রয়োজন। যা দিয়ে তা অর্জন করাই সম্ভব হয়। আজকের দিনের পর কোন আমল করা যাবে না। পরবর্তী সময় আসবে হিসাব নিকাশের। অতঃপর শাওযার ইমাম হোসাইনের সামনে আসলেন। তাঁকে সালাম করলেন। যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলেন। যুদ্ধ করলেন। শহীদ হয়ে গেলেন। শাওযাবের শাতাদাত বরণের পর তাঁর মালিক আবেস ইবনু শাবীব এসে বললেন :

يا ابا عبد الله اما والله ما امسى على ظهر الارض قريب ولابعيد اعز على ولاحب الى منك ولو قدرت على ان ادفع عنك الضيم والقتل بشئى اعز على من نفسى ودمى لفعلته السلام عليه ياابا عبد الله اشهد الله انى على هديك وهدى ابيك ثم مشى بالسيف مصلتا نحوهم وبه ضربة على جبينه – (الطبرى ج٥ ص٢٥٤، ٢١هـ)

"হে আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহর কসম, মাটির উপর আমার কোন নিকট আত্মীয় বা দূরআত্মীয় যেই হোক না কেন আপনার চেয়ে প্রিয় ও স্নেহের আমার আর কেউ নেই। আমার যদি শক্তি থাকত যে আমার প্রাণ ও রক্তের চেয়ে প্রিয় কোন বস্তু দ্বারা আপনার প্রতি কৃত জুলুম ও হত্যাকাণ্ডকে ঠেকিয়ে রাখি তাহলে তা দিয়ে আমি তা

করতাম। আপনার প্রতি আমার সালাম ওহে আবু আব্দুল্লাহ! আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনার পথ নির্দেশ ও আপনার পিতার পথ নির্দেশের উপর কায়েম আছি। অতঃপর তিনি তরবারী উন্মুক্ত করে দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার ললাটে একটি আঘাত দেখা যায়।[৪]

আল্লাহ আকবার! কি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন তাঁরা। অন্তরে কানায় কানায় নবী বংশের প্রেম পরিপূর্ণ ছিল তাঁদের। কত ভাগ্যবান ছিলেন মালিক ও মুক্তদাস যাঁরা অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিলেন কারবালার যুদ্ধ ময়দানে। পেছনে আঘাত খাননি, খেয়েছেন সামনে ললাটে। আবেস ইবনু শাবীবকে পূর্বেই জানত রবী ইবনু তামীম। রবী সেদিন কারবালায় উপস্থিত ছিল। রবী বলেঃ তাঁকে যখন আসতে দেখলাম তাঁকে আমি চিনে ফেললাম। আমি বহু যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে দেখেছিলাম। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। আমি তাঁকে দেখে বললাম ওহে লোকেরা! এই যে কালো বাঘের আগমন। এই আবু শবীবের বেটা, তার সামনে কেউ যাবে না। তিনি ডাকছিলেন পুরুষের মুকাবিলায় কোন পুরুষ আসবে কি! সেনাপতি উমর ইবনু সা'দ বলল ঃ তাঁকে পাথর মারো। তখন চতুর্দিক হতে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। তিনি এ অবস্থা দেখে তাঁর গায়ের বর্ম ও শির আবরণী লোহার টুপি খুলে ফেলেদিলেন। আর লোকজনের উপর আক্রমণ চালালেন। তিনি একাই দু'শর অধিক লোককে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতেন। বহুক্ষণ পর লোকেরা ফিরে এসে চারদিক থেকে তাঁর উপর চড়াও হয়। তখন তিনি শহীদ হয়ে যান। তাঁর খণ্ডিত শির নিয়ে এজিদী সেনাদের মধ্যে কলহ বেঁধে যায়। সকলেই তাঁকে শহীদ করেছে বলে দাবী করে। ব্যাপারটি সেনাপতি উমর ইবনু সা'দের নিকট পৌছালে সেনাপতি বলে যে তার দেহে বহু বর্শার আঘাত রয়েছে। একা কেউ তাঁকে হত্যা করেনি। তখন বিবাদ থেমে যায়।[৫]

শরযোদ্ধা এজিদ ইবনু যিয়াদ

এজিদ ইবনু যিয়াদ বিশিষ্ট তীরান্দাজ ছিলেন। শরযোদ্ধা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রথমে উমর ইবনু সা'দের বাহিনীতে ছিলেন। ইমাম হোসাইনের প্রতি ইবনু সা'দের অমনোনীত মনোভাব আঁচ করে তিনিও হুর ইবনু এজিদের ন্যায় স্বপক্ষ ত্যাগ করে হযরত হোসাইনের পক্ষে চলে এসেছিলেন। ইমাম হোসাইনকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। শত্রুরা এগিয়ে আসছে দেখে তিনি ইমাম হোসাইনের সামনে হাটু গেঁড়ে তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তাঁর তীর ব্যর্থ যেত না।

তিনি তীর নিক্ষেপ করে বলে উঠতেন ঃ

انا ابن بهدله فرسان العرجله -

আমি বাহাদালার ছেলে। আরজালাহ গোত্রের প্রসিদ্ধ সৈনিক। ইমাম হোসাইন সে তীর নিক্ষেপ করলেই বলে উঠতেন ঃ

اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة -

"আয় আল্লাহ! তার তীর নিক্ষেপন সঠিক কর। আর তার বদলে তাকে জান্নাত দান কর।" তার মাত্র পাঁচটি তীর ব্যর্থ হয়। সেদিন তার তীরের আঘাতে পাঁচজন তা ৎক্ষণিকভাবে প্রাণ হারায়। জখমী হয় বহু লোক। তিনি যুদ্ধের প্রথম দিকেই সর্ব প্রথম শহীদ হন। তিনি সেদিন সমর সঙ্গীত রূপে বলেছিলেন ঃ

انا يزيد وابى مهاصر - اشجع من ليث بغيل خادر -

يارب انى للحسين ناصر - ولابن سعد تارك وهاجر -

আমার নাম এজিদ, ডাক নাম আবু মুহাছির, আমি ঘন অরণ্যে বাসকারী প্রকাণ্ড সিংহ। হে আল্লাহ! আমি হোসাইনের সাহায্যকারী আর ইবনু সা'দকে পরিত্যাগকারী, প্রত্যখ্যানকারী।[৭]

হযরত আলী আকবার শহীদ হলেন

তখন ইমাম হোসাইনের সাথে রয়ে গেলেন সুউয়াইদ ইবনু আমর খাসআমী। এদিকে আবু তালিবের খান্দান হতে সর্ব প্রথম শহীদ হন হযরত হোসাইনের বড় ছেলে হযরত আলী ইবনু হোসাইন। তাঁর মা ছিলেন লায়লা বিনতে আবী মুররা। তিনি শত্রুদের উপর আক্রমণ শুরু করেন। তাঁর সমর সংগীত ছিল ঃ

انا على بن حسين ابن على- نحن ورب البيت اولى بالنبى-

تاالله لايحكم فينا ابن الدعى -

"আমি হলাম আলীর বেটা হোসাইনের বেটা আলী। কাবার মালিকের কসম আমরা নবীর অতি ঘনিষ্ঠজন। আমাদের ব্যাপারে হুকুম চালাতে পারে না বংশীয় পরিচয়হীন ব্যক্তি। তিনি এ সমর সংগীত গেয়ে চলছিলেন আর আক্রমণ করে যাচ্ছিলেন। নরাধম মুররা ইবনু মুসকিয তাঁকে দেখতে পায়। তাঁকে শহীদ করার পণ করে। সে বর্শা দিয়ে হামলা করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয়। তখন লোকজন তার উপর চড়াও হয়। তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। হুমাইদ ইবনু মুসলিম এযদী বলেন ঃ তিনি নিজ কানে শুনেছেন যে, ইমাম হোসাইন বলেছেন ঃ

قتل الله قوما قتلوك يابنّى مااجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول ، على الدنيا بعدك العفاء -

"ওহে বৎস! তোমাকে যারা কতল করেছে সে লোকদেরকে যেন আল্লাহ ধ্বংস করেন। এরা দয়া বানের প্রতি কত যে নির্ভয়! আর রাসূলের সম্মান বিনাশে কতো যে স্পর্ধা দেখায়! তোমার পর দুনিয়া তুচ্ছ বস্তু।"

প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন ঃ আমি একজন মহিলাকে দৌড়ে আসতে দেখতে পাই, মনে হয় যেন সূর্যের উদয় হচ্ছে। তিনি বিলাপ করে বলছিলেন ঃ হায় আমার ভাই! হায় আমার ভাতিজা! জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম তিনি ছিলেন নবীর মেয়ে হযরত ফাতিমার মেয়ে যায়নাব। তিনি এসে হযরত আলী আকবরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। হযরত ইমাম হোসাইন এসে তাঁকে তুলে তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। আর ছেলের লাশের নিকট চলে আসলেন। তাঁর সাথে চাকর বাকররাও ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের ভাইকে তুলে নাও। তারা হযরত আলী আকবরের লাশ উঠিয়ে তাবুর সামনে রাখলো। এ তাঁবুর সামনেই যুদ্ধ চলছিল।[৮] কি মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক দৃশ্য।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম বিন আকীল শরবিদ্ধ হলেন

অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনু আকীল শরবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলেন। নরাধম আমর ইবনু সবাই তাঁকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। তিনি তীর থেকে চেহারা রক্ষা করার জন্য দু'হাত দ্বারা চেহারা ঢাকার চেষ্টা করেন। জালিমের তীর এসে দু'হাতসহ ললাট বিদীর্ণ করে দেয়। হাত দু'খানি ললাটেই এঁটে যায়। আর একটি তীর এসে তাঁর বুক বিদীর্ণ করে চলে যায়। তখন তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।

আউন ও মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু জাফরের শাহাদাত

এরি মধ্যে যুদ্ধের ময়দানে এজিদী সৈন্যরা একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে পরস্পর হাতাহাতি যুদ্ধ চলতে থাকে। এক ফাঁকে হযরত জাআফারের নাতি আউন ও মুহাম্মদ আক্রানত হন। তারা শহীদ হয়ে যান। আউনকে হত্যা করে নরাধম আব্দুল্লাহ তায়ী আর মুহাম্মদকে কতল করে পাপিষ্ঠ আমের ইবনু নাহশালতাইমী।

জাফর ও আব্দুর রহমান ইবনু আকীল শহীদ হন

আবদুর রহমানকে আক্রমণ করে পাতক উসমান ও বিশর যুগপদভাবে। আর জাফরকে হত্যা করে আব্দুল্লাহ ইবনু আযরা তীর মেরে।

হযরত কাসেমের শাহাদাত

এজিদী বাহিনীর নরাধম হোমাইদ বলে ঃ সে দেখতে পায় এক যুবক যেন আকাশের চাঁদের টুকরা তাদের দিকে চলে আসছে। তার হাতে তলোয়ার, গায়ে জামা, পরনে ইযার ছিল। জুতার বাম পাশের ফিতা ছেঁড়া ছিল। নরাধম আমার ইবনু সাআদ তার উপর আক্রমণ চালায়। তলোয়ারের আঘাত খেয়ে যুবক মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। আর বিলাপ করে ডাকে। হায় চাচাজান! এ ডাক শুনে হোসাইন শিকারী বাজ পাখির ন্যায় আক্রমণ প্রতিহত করতে আসেন। নরাধম আমরকে তলোয়ারের আঘাতে বগল পর্যন্ত হাত কেটে আলাদা করে ফেলেন। তখন আমর চিৎকার করে ওঠে। কূফার অশ্ববাহিনী হোসাইনের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে ছুটে আসে। অশ্বের পায়ে পিষ্ঠ হয়ে নরাধম মারা যায়। ধূলাবালি পরিষ্কার হয়ে গেলে দেখা গেল ইমাম হোসাইন বালক কাসেমের মস্তক প্রান্তে দাড়িয়ে আছেন। আর বালক কাসেম মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। ইমাম হোসাইন বলে যাচ্ছেন ঃ

بعدالقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك ثم قال والله على عمك ان تدعوه فلايجيبك او يجيبك ثم لاينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره -

(الطبرى ج٥ ص٢٥٧)

"ধিক্কার এমন লোকের প্রতি যারা তোমাকে হত্যা করেছে। যাদের প্রতিপক্ষ হবেন কিয়ামতের দিন তোমার দাদা। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম তোমার চাচার জন্য কোন ওজরও ছিল না তুমি তাকে ডাকবে আর তিনি জবাব দেবেন না। বা জবাব দেবেন কিন্তু কোন শব্দ তোমার উপকারে আসবে না। আল্লাহর কসম তোমার চাচার রক্ত ঝরানোর লোক অনেক। আর তার সাহায্যকারী কম।"[৯]

অতঃপর ইমাম তার লাশ বহন করে আনলেন। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন ঃ আমি যেন দেখছি বালকের পা দু'টি মাটিতে রেখাপাত করে যাচ্ছে। আর ইমাম হোসাইন তার বুকের সাথে বালকের বুক চেপে ধরে আছেন। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন ঃ ভাবলাম লাশ নিয়ে তিনি কি করবেন। তিনি লাশটি নিয়ে এলেন। আর তাঁর ছেলে আলী ইবনু হোসাইনের সাথে রেখেদিলেন। যারা তাঁর পরিবারের লোক শহীদ হয়েছিলেন তাদের লাশ ও আলী আকবারের লাশের পাশে ছিল। দর্শক বলেন ঃ আমি জানতে চাই বালকটি কে? তখন তাকে বলা হয় বালক হচ্ছে কাসিম ইবনু হাসান ইবনু আলী ইবনু আবীতালিব

ইমাম হোসাইনের শাহাদাত

সকাল থেকে যুদ্ধ চলছিল। সাথীরা সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। নবী পরিবারের বাচ্চারাও যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হলো। ইমাম হোসাইন বাকী রইলেন। কাসেমের শাহাদাতের পর তিনি আরও ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি অতি মুসিবতে পাথরে পরিণত। সবই সহ্য করার মতো সৎ সাহস তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। কবি গালিবের ভাষায় বলা যায় ঃ

رنج سے خوگر انسان ہو تومٹ جاتاہے رنج
مشکلیں اتنی آپڑیں کہ آسان ہو گئیں-

"দুঃখে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়লে দুঃখ বেদনা মিটে যায়। এতো সংকট এসে গেছে যে, সবই সহজ হয়ে গেছে। ইমাম হোসাইন দিনের দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। তাঁকে হত্যা করার জন্য যেই আসত ফিরে চলে যেত। তাঁকে হত্যা করার মতো পাপ কাণ্ড করা থেকে বিরত থাকত। এমন জঘণ্য পাপের বোঝা বহন করতে কেউ রাযী হত না। আশ্চর্য বোধ হয়! যাঁকে হত্যা করা মহা পাপ বলে মনে করতো তাঁর বিরুদ্ধেই এরা সকাল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। তাঁর সঙ্গী–সাথীদেরকে হায়েনার মতো শহীদ করেছে। এ বৈপরীত্ত্যের ব্যাখ্যা কি? মানুষ এতো অন্ধ হয়? বহু সময় পর কিন্দা গোত্রের নুসাইরের পুত্র পাপিষ্ঠ মালিক আসল। আর এ জাহান্নামী পশু ইমাম হোসাইনের মস্তক মোবারকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। তাঁর শির চূড়ায় তখন রেশেমের বুনানো বুরনুস টুপি শোভা পাচ্ছিল। তাভেদ করে তলোয়ার মাথায় আঘাত হানে। ইমাম হোসাইনের শির মোবারক রক্তাক্ত হয়ে যায়। ইমাম হোসাইন তখন বলছিলেনঃ

لاكلت بها ولاشربت وحشرك الله مع الظالمين -

"এ আঘাতের বিনিময়ে তুমি যেন পানাহারের ব্যবস্থা করতে না পার। আর আল্লাহ যেন তোমাকে জালিমদের সাথে হাশরে উঠান।"১০

অতঃপর ইমাম বুরনস শিরাবরণটি খুলে ফেলে দেন। আর একটি টুপি চেয়ে নেন। তা মাথায় রেখে উপরে পাগড়ি বেঁধে নেন। আহত মস্তকে পাগড়ি বেঁধে তিনি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করেন। তিনি তখন রক্তক্ষরণে দুর্বল। কিছুটা হতাশ। এমন সময় আঘাতকারী উক্ত কিন্দী আবার আসে। সে এসে রক্তাক্ত বুরনুস টুপিটি উঠিয়ে নিয়ে যায়। টুপিটি মোটা সিল্কের বোনা ছিল। বুরনুস নিয়ে সে বাড়ীতে ফিরলে তার স্ত্রী বুরনুসটির রক্ত ধুয়ে ফেলে। আর বলে তুমি রাসূলের নাতির শিরাবরনী বুরনুস এনেছো? যে ঘরে এ বুরনুস থাকবে আমি সে ঘরে অবস্থান করব না। এ কথা বলে ভদ্র মহিলা বিদায় নিয়ে চলে যান। বুরনুস এনে ঘাতক চাচ্ছিল তা দেখিয়ে এজিদের নিকট থেকে এ আঘাতের বিনিময়ে অর্থ–এনাম হাসিল করবে। ইমাম হোসাইন তা আন্দাজ করে ফেলেছিলেন। আর তার এ নিকৃষ্ট অভিপ্রায় যাতে পূরণ না হয় সে জন্য উপরে বর্ণিত বদদোওয়া করেন। পরে দেখা গেল লোকটি আজীবন আর্থিক অনটনে ভূগেছে। ইমাম হোসাইনের বদদোওয়া লেগেছে। মৃত্যু পর্যন্ত সে আর্থিক অনটনের শিকার ছিল। দরিদ্রতা তাকে পীড়া দিত।

শিশু শহীদ আব্দুল্লাহ ইবনু হোসাইন

ইমাম হোসাইন আহত হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর ঔরসে এক শিশুর জন্ম হয়। লোকেরা শিশুটিকে তার পিতা ইমাম হোসাইনের কোলে তুলে দেয়। ইমাম হোসাইন শিশুটিকে কোলে নিলেন। এমন সময় এক হৃদয়হীন পাপাত্মা তীর মেরে শিশুটিকে শহীদ করে দেয়। পাপীটি ছিল বনু আসাদ গোত্রের লোক। একবার ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনু আলী ইবনু হোসাইন (ইমাম যয়নুল আবেদীন) উকবা ইবনু বশীর কিন্দিকে বলেছিলেন ঃ উকবা! তোমাদের আসাদ গোত্রে আমাদের রক্তের দাবী রয়েছে। উকবা বললেন এতে আমার কি কোন অপরাধ রয়েছে? আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন হে ইমাম আবু জাআফার! আর সে রক্তের দাবীটি কী? তখন ইমাম জয়নুল আবদীন বলেন ঃ ইমাম হোসাইনের সদ্য প্রসূত এক শিশু এনে তাঁর কোলে দেয়া হয়। তিনি শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসা ছিলেন। এমন সময় তোমাদের এক বনু আসাদের ব্যক্তি–শিশুটিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে। আর তাকে শহীদ করে ফেলে। ইমাম হোসাইন শিশুর রক্ত হাত পেতে নিলেণ। তাঁর হাতের অঞ্জলি ভরে গেল। তিনি প্রবাহিত রক্ত মাটিতে ঢেলে দিলেন। আর বললেন ঃ

رب ان تك حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذالك لما هو خير وانتقم لنا من هؤلاء الظالمن -

"হে আল্লাহ! তুমি যদি আসমান হতে সাহায্য করা বন্ধ করে দিয়ে থাক তাহলে আমাদের জন্য এটাকে ভালোয় পরিণত করে দাও। আর আমাদের হয়ে জালিমদের প্রতিশোধ নাও।"[১১]

আল্লাহর কার্যকলাপ ধারনাতীত। দোয়াও কার্যকর হয়। মুখতার সাকফীর আবির্ভাব হয়। সে তালাশ করে ইমাম হোসাইনের শত্রুদেরকে বের করে হত্যা করে। জ্বালিয়ে দেয়। তাদের ভিটি বাড়ী পর্যন্ত ধ্বংস করে। ইমাম হোসাইনের কোলে যে শিশুটি শহীদ হয় তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু হোসাইন। আর এক নরাধম উকবার পুত্র আব্দুল্লাহ সে ইমাম হোসাইনের আর এক সন্তান আবু বাকর ইবনু হোসাইনকে তীর মেরে শহীদ করে। এ দু'টি হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে কবি ইবনু আবী আকব বলেন ঃ

وعند غنىّ قطرة من دمائنا - وفى اسد اخرى تعد وتذكر -

"গানাবী গোত্রে এবং বনু আসাদ গোত্রে আমাদের ঝরানো রক্তের ফোঁটা পড়েছে। যা গণনা করা হবে, ইতিহাসে আলোচিত হবে।"

ইমাম হোসাইনের পরিবার বহির্ভূত সাথীদের শাহাদাত বরণ করার পর একে একে ইমাম পরিবারের সদস্য শহীদ করা আরম্ভ হয়। তাঁদের পর শহীদ হন ইমাম পরিবারের আব্দুল্লাহ জাআফার, উসমান। তাঁরা সবাই ময়দানে যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আলী ইবনু আবী তালিবকে কতল করে হানী হাযরামী। পরে সে আক্রমণ করে জাআফার ইবনু আলীর উপর। আর তাকে কতল করে দেয়। তার খণ্ডিত মস্তক নিয়ে যায়। উসমান ইবনু আলী ইবনু আবী তালিবের প্রতি খাওলা আসবাহী তীর নিক্ষেপ করে। পরে অন্য এক ব্যক্তি তাকে কতল করে। বনু আবানের এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনু আলী ইবনু আবী তালিবকে তীর মেরে শহীদ করে। আর তার মস্তক কেটে নিয়ে যায়। হানী ইবনু সুবাইত পাষণ্ড ইমাম পরিবারের আর এক জন বালক হত্যা করে। সে নিজে বলেছে ঃ ইমাম হোসাইনের তাবু হতে এক বালক একবারে মতির মতো সুন্দর বের হলো। তার কর্ণে স্বর্ণের বালা ছিল। হাতে একটি তাবুর স্তম্ভ নিয়ে সে বের হয়ে আসে। অত্যন্ত ভীতির মধ্যে সে সামনে আসে। আর হানী তাকে তলোয়ারের এক আঘাতে শহীদ করে দেয়। কি পৈশাচিক আচরণ! বালক তাও তাবুর দণ্ড নিয়ে ময়দানে আসে। ভয়ে ভীত দেখায়। তবু তাকে নরাধমরা ক্ষমা করেনি। কাপুরুষের ন্যায় তার উপর হামলা চালায় আর হত্যা করে।

ফুরাত কূলে ইমাম হোসাইন

জাবির জুফী বলেন ঃ ইমাম হোসাইন পিপাসার্ত হন। পিপাসা তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি ফুরাতে নেমে পানি পান করতে যান। পানি হাতের অঞ্জলিতে উঠাতেই হুসাইন ইবনু নুমাইর তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি ইমাম হোসাইনের মুখমণ্ডলে বিদ্ধ হয়। তিনি তখন তার মুখমণ্ডলের রক্ত হাত পেতে নেন এবং আকাশ পানে নিক্ষেপ করেন। এরপর তিনি আল্লাহর প্রসংশা করেন। পরে দু'হাত তুলে একত্র করে দোওয়া করেন ঃ

فقال : اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولاتزر على الارض منهم احدا - (الطبرى ج٥ ص٢٥٨ ، ٢١هـ)

"হে আল্লাহ! এদেরকে গণনা করে রাখ। এদেরকে নিকৃষ্টভাবে হত্যা কর। পৃথিবীতে এদের কাউকে জীবিত রেখো না।"১২

ইমাম হোসাইনের দোয়াটি অক্ষরে অক্ষরে কার্যকর হয়। ইহাম হোসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পশুগুলোকে পরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কেউ রেহাই পায়নি। অধিকাংশ মুখতার সাকাফীর হাতে নিহত হয়। আর কিছু খোদায়ী গজবে পড়ে। কাসেম ইবনু আসবাতা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে বলেন ঃ পর্যুদস্ত সাথী সঙ্গীদের সবার শহীদ হবার পর যুদ্ধে বিধ্বস্ত পর্যুদস্ত ইমাম হোসাইন একটি ছোট বাহনে চড়ে ফুরাত পানে অগ্রসর হন। তখন লোকেরা তাঁকে বাঁধা দেয়। বাঁধা দানে নেতৃত্ব দেয় বনু আবানের এক ব্যক্তি। তাকে অনুরসরণ করে অন্যরা। তারা ইমাম হোসাইনের পথরোধ করে দাঁড়ায়। তারা তাঁকে ফুরাতের কূলে পৌছুতে দিতে চায় না। তখন ইমাম হোসাইন বলেন ঃ

اللهم اظمئه "হে আল্লাহ! লোকটিকে পিপাসার্ত রেখ। আবান গোত্রের লোকটি তীরদানী থেকে একটি তীর উঠিয়ে নেয়। ইমাম হোসাইনের গণ্ডদেশে তীর নিক্ষেপ করে। ইমাম হোসাইন তীরটি গলা থেকে খুলে ফেলেন। তিনি দু'হাত পেতে দেন। তাঁর হাত রক্তে ভরে যায়। ইমাম বলেন ঃ

اللهم انى اشكو اليك ما يفعل يابن بنت نبيك قال فوالله ان مكث الرجل الايسيرا حتى صب الله عليه الظمأ فجعل لايروى - (الطبرى ج٥ ص٢٥٨، ٢١هـ)

"হে আল্লাহ! তোমার নবীর মেয়ের সন্তানের সাথে যা করা হচ্ছে, সে বিষয়ে আমি তোমার নিকট অভিযোগ করছি। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন ঃ আল্লাহর কসম কিছুক্ষণের মধ্যেই তীর নিক্ষেপকারী চরমভাবে পিপসায় আক্রানত হয়। যতোই পানি পান করুক কোন মতেই তার পিপাসা নিবারণ হত না।" ১৪

কাসেম ইবনু আসবাগ বলেন ঃ আমি তার সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। তাকে আরাম দেয়ার চেষ্টা করি। তার জন্য পানি ঠাণ্ডা করা হত। তাতে চিনি ও দুধ মিশিয়ে পানীয় প্রস্তুত করা হত। আর বড় বড় পিয়ালা মটকী ভরে পানি রাখা হত। আর সে বলত ঃ কোথায় তোরা ধ্বংস হও আমাকে পানি পান করাও পিপাসায় মরে যাচ্ছি। তখনই দুধ মিশ্রিত পানীয় পেয়ালা বা মটকী ভরা পানি তাকে দেয়া হত। সে তা পান করত। তার মুখ হতে পিয়ালা সরাতেই সে কিছুক্ষণ গা এলিয়ে দিয়ে শয়ন করতো। পরক্ষণেই বলত ঃ ধ্বংস হও; আমাকে পানি পান করাও। পিপাসা আমাকে মেরে ফেলল। কাসেম ইবনু আসবাগ বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম অচিরেই তার পেট ফুলে উটের পেটের মতো বিশাল হয়ে ফেটে পড়ল।১৫

শিমারের উসকানি

শিমার দশজনের মত কূফাবাহিনীর জওয়ান নিয়ে ইমাম হোসাইনের অবস্থানে আসে। সেখানে ইমামের আসবাবপত্র ও পরিবারের মহিলারা ছিলেন। তারা ইমামের নিকট এসে তাঁর মধ্যে ও তাঁর পরিবার বর্গের মধ্যে আড় হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম হোসাইন তাদেরকে বললেন ঃ

ويلكم ان لم يكن لكم دين وكنتم لاتخافون يوم المعاد فكونوا فى امر دنياكم احرارا ذوى احساب امنعوا رحلى واهلى من طغامكم وجهالكم فقال ابن ذى الجوشن ذلك لك يابن فاطمة - (الطبرى ج٥ ص٢٥٨)

কি করছ তোমরা? তোমদের দ্বীন ধর্ম না থাকলে আখিরাতের ভয় না থাকলে কমপক্ষে পার্থিব বিষয়ে ভদ্রতাতো রক্ষা করবে! শিষ্ঠাচার রক্ষাকারীদের মধ্যেতো গণ্য হবে! আমার পরিবারবর্গ হতে আমার অবস্থান হতে তোমাদের গণ্ডমূর্খ লোকগুলোকে ফিরিয়ে রাখ। শিমার বলল ঃ হে ফাতিমার ছেলে যাও তাই হবে তোমার জন্য।

শিমার পদাতিক বাহিনীর বিশিষ্ট লোকদের নিয়ে অগ্রসর হল। তার সাথে আবুল জুনূব আবদুর রহমানও চিল। শিমার তাদেরকে প্ররোচিত করতে লাগলো। অস্ত্রে প্রায় ডুবে থাকা আবুল জূনুবকে বলল ঃ হোসাইনের ওপর আক্রমণ কর। আবুল জূনুব বলল ঃ তুমি কেন এ কাজ কর না? শিমার তাকে বলর ঃ আমার হুকুমের জবাবে আমাকে তুমি এমন কথা বলছ? আবুল জূনুব তাকে বলল ঃ আর তুমি আমাকে এহেন জঘণ্য কাজ করতে বলছ? তাদের দু'জনের মধ্যে এরূপে বাক্য বিনিময় হতে থাকে। আবুলজূনুব নির্ভীক ব্যক্তি ছিল। সে বললো ঃ আল্লাহর কসম আমি তোমার চোখে বর্শার অগ্রভাগ ঢুকিয়ে দেব। এ কথা শুনে শিমার তাকে রেখে এ কথা বলতে বলতে চলে গেল ঃ কোন সুযোগ পেলে আল্লাহর কসম তোমার ক্ষতি অবশ্যই করব।

এক নির্ভীক বালক

অতঃপর শিমার পদাতিক বাহিনীর কতিপয় লোক নিয়ে ইমাম হোসাইনকে আক্রমণ করে। ইমাম হোসাইন তাদের প্রতিহত করার জন্য পাল্টা হামলা চালান। তারা তখন পালিয়ে যায়। পরে এসে তারা চারদিক থেকে ইমামকে ঘেরাও করে। এ অবস্থা দেখে ইমাম হোসাইনকে রক্ষা করার জন্য এক বালক তাঁবুর ভেতর হতে বের হয়। হযরত আলীর মেয়ে যায়নাব তাকে আটকে রাখেন। বেরোতে দেননি। ইমাম হোসাইন বোনকে বললেন ঃ ওকে বেরোতে দেবে না। ছোট বালকটি তা মানতে রাযী হয় না! দৌড়ে ইমামের নিকট চলে আসে। আর তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে যায়। ইমাম হোসাইনকে এজিদ সেনা বাহর ইবনু কাআব হত্যা করার জন্য তালোয়ার উত্তোলন করে। বালক তাকে ধমকিয়ে বলে ওহে অপবিত্রা মায়ের সন্তান! তুইকি আমার চাচাকে হত্যা করবি? নরাধম বাহর ইবনু কাআব তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। বালক হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে। তার হাত কেটে গিয়ে কাঁধের সাথে ঝুলতে থাকে। আর বালক হায় আমার মা বলে চিৎকার দিয়ে উঠে। তখন ইমাম তাকে বুকে চেপে ধরেন। আর বলেন ঃ

يابن اخى اصبر على مانزل بك واحتسب فى ذالك الخير فان الله يلحقك بآبائك الصالحين برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بن ابى طالب وحمزة وجعفر والحسن بن على صلى الله عليهم - (الطبرى ج٥ ص٢٥٩)

"আমার ভাতিজা! সবুর কর তোমার প্রতি নাযিলকৃত অবস্থার প্রতি। আর এর পর উত্তম প্রতিদান আশা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে তোমার পূর্ব পুরুষদের নিকট পৌঁছে দেবেন। রাসূলুল্লাহর নিকট, আলী ইবনে আবী তালিবের নিকট, হামযার নিকট, জাফরের নিকট, হাসানের নিকট তাদের সবার প্রতি আল্লাহর করুণা হোক।" ১৬

ইমাম হোসাইনের জবাবী হামলা

নিষ্পাপ বালকের প্রতি এজিদ সেনার উক্ত আক্রমণে ব্যথিত হয়ে ইমাম হোসাইন আবার আল্লাহকে স্মরণ করে বলেন ঃ

اللهم امسك عنهم قطر السماء وامنعهم بركات الارض اللهم ان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولاترض عنهم الولاة ابدا فانهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا - قال ضارب الرجالة حتى انكشفوا عنه -

(الطبرى ج٥ ص٢٥٩)

"হে আল্লাহ! তাদের বৃষ্টি বন্ধ করে দাও। তাদের প্রতি মাটির বরকত রুখে দাও। তাদেরকে যদি তুমি কিছু দিন অবকাশও দাও তবে তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। তাদের মধ্যে মতের অমিল ঘটাও। তাদের প্রতি শাসকদেরকে সদা অসন্তুষ্ট রাখ। কারণ তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে ডেকে এনেছে। অতঃপর আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। আমাদেরকে হত্যা করেছে।" তারপর তিনি পদাতিক বাহিনীর প্রতি জবাবী হামলা চালান। তারা পালিয়ে যায়।

শাহাদাতের পূর্বলগ্নে ইমাম হোসাইন

এজিদী পশু সেনাদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছিল ইমাম হোসাইনের। তখন তাঁর মাত্র তিন কি চারজন সাথী জীবিত ছিলেন। তিনি উত্তম চোস্ত পায়জামা চেয়ে নিলেন। পায়জামাটি ইয়ামন দেশী কাপড়ের ছিল। তিনি তা ছিঁড়ে ফুটু করে দিলেন, যাতে ভালো পয়জামার লোভে কেউ তাঁকে বিবস্ত্র করে না ফেলে। সাথীদের কেউ বললেন নিচে জাংগিয়া পরে নিলে হয় না? তিনি বলেন ঃ জাংগিয়া নিকৃষ্ট লেবাস। এ ধরনের

লেবাস আমি পরতে পারি না। অবশ্য তিনি শহীদ হলে ঘাতক বাহর ইবনু কাআব তা ছিনিয়ে নেয় এবং ইমামকে বিবস্ত্র রেখে যায়। ইমামের অভিশাপে বাহর ইবনু কাআবের হাত থেকে শীতকালে পানি ঝরত এবং গরমের মৌসুমে তা শুকিয়ে কাঠের মতো হয়ে যেত।

আব্দুল্লাহ ইবনু আম্মারও এজিদ বাহিনীতে ছিল। ইমাম হোসাইনকে সেও আক্রমণ করে। সে বলে ঃ আমি তাঁকে আঘাত করিনি। ইচ্ছা করলে করতে পারতাম। মনে মনে ভাবি আমি তাঁকে হত্যা করব না, অন্যরা করুক। পদাতিক বাহিনী তার উপর ডান দিক থেকে হামলা চালায়। তিনি তাদের হামলা প্রতিহত করেন। বামদিক থেকে হামলা চালায়। তিনি তাও প্রতিহত করে দেন। তারা সরে যায়। তিনি গায়ে মোটা সিল্কের জামা জড়িয়ে ছিলেন। মাথায় পাগড়ি পরে ছিলেন। আব্দুল্লাহ আম্মার বলে ঃ আল্লাহর কসম তাঁর মতো বীর আমি তার পূর্বে ও পরে কখনো দেখিনি। তাঁর সাথী সন্তান আটজন তাঁর সামনে শহীদ হলেন, তিনি বিচলিত হলেন না। ডান ও বাম হতে পদাতিক বাহিনী মেষ পালের মতো পলায়ন করত। যেমন মেষ পালে বাঘের আক্রমণ হলে অবস্থা দাঁড়ায়। যায়নাব তখন অস্থির চিত্তে সব লক্ষ্য করেন। তিনি বলেনঃ لیت السماء تطابقت علی الارض আসমান যদি ধরায় ভেঙ্গে পড়ত। এমতাবস্থায়ও তিনি আক্রমণ প্রতিহত করতেন। আর বলতেন ঃ

اعلی قتلی تحاثون اما والله لاتقتلون بعدی عبدا من عباد الله الله اسخط علیکم لقتله منی - وایم الله انی لارجو ان یکرمنی الله بهوانکم ثم ینتقم لی منکم من حیث لاتشعرون -

তোমরা আমাকে হত্যা করার জন্য একত্রিত হচ্ছো? আল্লাহর কসম আমার পর তোমরা আল্লাহর অন্য কোন বান্দাকে হত্যা করতে পারবে না, যাকে হত্যা করার দরুন আল্লাহ আমাকে হত্যা করার চেয়ে বেশী নারায হবেন। আল্লাহর কসম, আমি আশা পোষণ করি যে, তোমাদেরকে তিনি অপদস্ত করে আমাকে সম্মানিত করবেন। অতঃপর তোমাদের নিকট হতে তিনি প্রতিশোধ নেবেন এমন ভাবে যে তোমরা অনুভবও করতে পারবে না।

اما والله ان لوقد قتلتمونى لقد القى الله بأسكم بينكم وسفك دمائكم ثم لايرض لكم بذالك حتى يضاعف لكم العذاب الاليم -

আল্লাহর কসম, তোমরা যদি আমাকে হত্যাই করে ফেল, তাহলে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ যুদ্ধবিগ্রহ ঢেলে দেবেন। তোমাদের মাঝে রক্তপাত ঘটবে। শুধু এতটুকুতে আল্লাহ রাযী হবেন না। পরিণামে তিনি বেদনাদায়ক আযাব দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেবেন।[১৭]

ইমামের শির কর্তন

ইমাম হোসাইন দিনের বহু সময় পর্যন্ত টিকে থাকেন। লোকেরা ইচ্ছা করলে তাঁকে হত্যা করে ফেলতে পারতো। কিন্তু তারা কেউ এ পাপ করতে অগ্রসর হয়নি। "অন্যের দ্বারা এ কাজ হয়ে থাক। আমি সরে থাকি"–এ ভাব ছিল। শিমার উস্কানি দিয়ে বলল ঃ তোমাদের কি হল? এখনো লোকটিকে সময় দিয়ে রেখেছ কেন? কি দেখছ? তাঁকে হত্যা কর না কেন? তোমাদের মায়েরা তোমাদের জন্য কাঁদুক! তখন চার দিক থেকে পুনরায় আক্রমণ শুরু হয়। যুরআ ইবনু শোরাইক তায়মী ইমামের বাম হাতে আঘাত করে। আর কাঁধের উপর প্রহার করে। অতঃপর তারা ফিরে যায়। তিনি তখন উঠতে গেলে উবু হয়ে পড়ে যেতেন। এ অবস্থায় তাঁর উপর আক্রমণ চালায় নখয়ী গোত্রের 'সিনান ইবনু আমর'। সে ইমাম হোসাইনকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। তখন ইমাম মাটিতে পড়ে যান। সিনান খাউলি ইবনু এজিদকে শির মোবারক কেটে ফেলতে বলে। সে শির মোবারক কাটতে গেলে তার হাত কেঁপে উঠে। গায়ে কম্পন ধরে যায়। তখন সে দুর্বলতা দেখায়। তাকে ধমক দিয়ে নরঘাতক সিনান তাকে বলে তোর বাহু চূর্ণ হোক! তোর দু'হস্ত ছিন্ন হোক! সে নিজে নেমে এসে ইমাম হোসাইনকে যবাই করে ফেলে। তাঁর শির মোবারক কেটে ফেলে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন–। অতঃপর সে শির মোবারক খাউলি ইবনু এজিদের হাতে তুলে দেয়। খাউলি ইবনু এজিদই প্রথমে ইমাম হোসাইনকে আঘাত করেছিল তরবারি দিয়ে।[১৮]

বিদীর্ণ ইমাম দেহ ও মালামাল লুট

হযরত জাআফার ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আলী বলেছেন ঃ ইমাম হোসাইন শহীদ হবার পর তার পবিত্র দেহে ৩৩টি বর্শার জখম ৩৪টি তলোয়ারের আঘাত পরিলক্ষিত হয়। ইমাম হোসাইনের যাবতীয় জিনিষপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাহর ইবনু কাআব নেয় পরনের পায়জামা। কায়েস ইবনু আশআস নিয়ে যায় চাদর মোবারক। এটি ছিল মোটা 'খাজী' কাপড়ের। পরে তার নাম হয়ে যায় 'চাদরওয়ালা কায়স।' আসওয়াদ নেয় পাদুকা মোবারক। বনু নাহশালের এক ব্যক্তি নিয়ে যায় তলোয়ার। লোকেরা ইমামের মালামাল লুট করে। খুশবু, কাপড়-চোপড়, উট সবাই লুট হয়ে যায়। আসবাবপত্র সব লুটে নিয়ে যায়। মহিলাদের বসনের কাপড় পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়া হয়। কী পশু আচরণ এজিদ বাহিনীর![১৯]

কারবালায় সর্বশেষ শহীদ

উসাইদ ইবনু আমর ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি কারবালায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে তিনি আহত হয়ে লাশগুলোর সাথে পড়ে ছিলেন। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। ইমাম হোসাইনকে শহীদ করার পর লোকেরা বলতে লাগল ইমাম হোসাইন শহীদ হয়ে গেলেন। এ আওয়ায তাঁর কানে পৌঁছায়। তিনি অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ান। দেখতে পান তাঁর তরবারি কে যেন নিয়ে গেছে। মাত্র ছোরাটা পড়ে আছে। তা নিয়ে তিনি এজিদ বাহিনীকে আক্রমণ করে বসেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুপক্ষ তাঁকে ঘিরে ফেলে। তাঁকে উরওয়া ইবনু বাত্তার এবং যায়েদ ইবনু রুকাদ শহীদ করে দেয়। তিনিই হলেন কারবালা ময়দানের সর্বশেষ শহীদ। আল্লাহ তার প্রতি সদয় হোন, আমীন।

অশ্ব খুরে ইমাম দেহ দলিত—মথিত

ইমাম হোসাইনকে শহীদ করেই এজিদের লোকেরা ক্ষান্ত হয়নি। উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের নির্দেশ মত তাঁর লাশ অশ্ব খুরে দলিত করা হয়। ইসহাব ইবনু হায়াত হাযরামী, আহবাশ ইবনু মারসাদ অশ্ব পদদলনে নেতৃত্ব দেয়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু জারীর তাবারী লিখেন

فاتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصدره -

ঘোটক বাহিনী আসল। তারা ইমাম হোসাইনের লাশের উপর দিয়ে ঘোড়াগুলো দাবড়িয়ে তাঁর পিঠের হাঁড় ও বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিল।" নেতৃত্ব দানকারী আহবাশ ইবনু মারসাদ কিছুদিন পর অজানা এক তীর লেগে প্রাণ হারায়। তীর তার বক্ষ বিদীর্ণ করে চলে যায়।[২০]

শির মোবারকের অলৌকিক ঘটনা!

খাউলী ইবনু এজিদের হাতে উমর ইবনু সা'দ হযরত ইমাম হোসাইনের শির মোবারক পাপিষ্ট উবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। কূফা নগরে তখন রাত। খাউলী শির মোবারক নিয়ে বাড়ীতে চলে যায়। আবর্জনাস্তূপে শিরটি লুকিয়ে রাখে। খাউলীর দু'জন স্ত্রী ছিল। তার এক স্ত্রীর নাম নাওয়্যার ছিল। নাওয়্যার বলল, কি আনলে? খাওলী বলে যে হোসাইনের মস্তক নিয়ে এসেছি। এ কথা শুনে নাওয়্যার চটে গেল। বলল ঃ লোকেরা স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে এলো। আর তুমি কিনা রাসূলের নাতির মস্তক এনেছ। আমি আজ তোমার সাথে থাকছি না। সে রাতে নওয়্যারের পালা ছিল। খাউলী অপর স্ত্রীকে নিয়ে রাত কাটায়। এদিকে নাওয়্যার বাইরে বসে যেখানে ইমাম হোসাইনের মস্তক রাখা ছিল সেদিকে তাকিয়ে রইল। দেখতে পেল আসমান হতে একটি লম্বা আলো ইমাম হোসাইনের কর্তিত মস্তকের উপর ঝুলে রয়েছে। সকাল পর্যন্ত নাওয়্যার এ দৃশ্য দেখে রাত কাটিয়ে দেয়।[২১]

ইমাম হোসাইন শহীদ হওয়ার ক'দিন পর গাফিরিয়্যা পল্লির লোকেরা কারবালায় এসে হযরত ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথীদের লাশ দাফন করেন। আল্লাহ শহীদে কারবালা ও তার শহীদ সাথীদের প্রতি অশেষ করুণা করুন।

সূত্র সূচী ঃ

১· তাবারী ঃ ৫ম খণ্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা।
২· ঐ ঃ ঐ ২৫৫ "
৩· ঐ ঃ ঐ ২৫৫ "
৪· ঐ ঃ ঐ ২৫৫ "
৫· ঐ ঃ ঐ ২৫৫ "
৬· ঐ ঃ ঐ ২৫৬ "
৭· ঐ ঃ ঐ ২৫৬ "
৮· ঐ ঃ ঐ ২৫৬ "
৯· ঐ ঃ ঐ ২৫৭ "
১০· ঐ ঃ ঐ ২৫৭ "
১১· ঐ ঃ ঐ ২৫৭ "
১২· ঐ ঃ ঐ ২৫৮ "
১৩· ঐ ঃ ঐ ২৫৮ "
১৪· ঐ ঃ ঐ ২৫৮ "
১৫· ঐ ঃ ঐ ২৫৮ "
১৬· ঐ ঃ ঐ ২৫৯ "
১৭· ঐ ঃ ঐ ২৬০ "
১৮· ঐ ঃ ঐ ২৬০ "
২০· ঐ ঃ ঐ ২৬০ "
২১· ঐ ঃ ঐ ২৬০ "
২২· ঐ ঃ ঐ ২৬০ "

এজিদী প্রচারণায় বিভ্রান্ত জনতা

এজিদ উত্তম ব্যক্তি ছিল, আমীরুল মুমিনীন ছিল, যাঁরা তার বিরোধীছিল তাঁরা ভ্রষ্ট ও বিদ্রোহী ছিলেন, যাঁদেরকে হত্যা করা বৈধ ছিল, ইত্যাদি প্রচারণা চলত এজিদের তরফ হতে। সিরিয়ার জনগণের একাংশ এরূপ অপপ্রচারের শিকার হয়। আর ইমাম হোসাইনও তাঁর পরিবারবর্গের নির্মম হত্যা কান্ডকে বৈধ মনে করে। নবীর পরিবারের লোকজন বন্দী হয়ে সিরিয়ায় পৌছলে পর এরূপ বিভ্রান্ত অংশের এক বৃদ্ধ এসে ইমাম জয়নুল আবিদীনকে উদ্দেশ্য করে বলেঃ

دنا شيخ من السجاد (ع) وقال له الحمد لله الذى اهلككم وامكن الامير منكم :

"আল্লাহকে ধন্যবাদ। যিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করেছেন। আর আমীর (এজিদ) কে তোমাদের বশ করার ক্ষমতা দান করেছেন।"

ইমাম জয়নুল আবিদীন বৃদ্ধের বিভ্রান্তি অনুধাবন করেন। আর তার ভ্রান্তি নিরসনকল্পে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

আপনিকি কুরআন পড়েছেন?

বৃদ্ধ বললেনঃ হাঁ, কুরআন পড়েছি।

ইমাম জয়নুল আবিদীন বলেন যে, আপনি কি এ আয়াত পাঠ করেছেন?

قُلْ لاَاَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -

"বলে দাও, এ কাজের বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোন কিছু চাইনা। তবে আমার নিকটজনের প্রতি মহব্বত কামনা করি।"

আর আপনি কি আল্লার বাণী

وَآتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ -

"নিকট আত্মীয়কে তার প্রাপ্য প্রদান কর" আয়াত পড়েছেন? আর আল্লার বাণী

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى -

–" জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জন কর তার পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য এবং রাসূলের নিকট আত্মীয়ের জন্য–" আয়াত পড়েছেন?

উত্তরে বৃদ্ধ বললেন ঃ হাঁ আমি তা পাঠ করেছি। তখন ইমাম জয়নুল আবিদীন বলেন ঃ এসব আয়াতে বর্ণিত নিকট আত্মীয় আমরাই।

অতপরঃ ইমাম জয়নুল আবিদীন তাঁকে বললেন ঃ আপনি কি আল্লাহর বাণী ঃ

انَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

– "অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছা তিনি তোমাদের আহলে বাইতদের থেকে অপবিত্র দূর করে তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান?

বৃদ্ধ বললেন পড়েছি বৈকি?

ইমাম জয়নুল আবিদীন বললেনঃ আমরাই আহলে বাইত যাঁদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহ পবিত্র করেছেন।

বৃদ্ধ এ বিবরণ শুনে ইমাম জয়নুল আবিদীনকে কসম দিয়ে বললেনঃ

قال الشيخ : بالله عليك انتم هم فقال عليه السلام وحق جدنا رسول الله انا نحن هم من غير شك -

–"আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি। আপনারা–ই কি ঐ লোক। ইমাম জয়নুল আবিদীন বললেনঃ

রাসূলুল্লাহর প্রাপ্যের নাম করে বলছি এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই যে, আমরা ঐলোক। একথা শুনে বৃদ্ধ ইমাম জয়নুল আবিদীনের পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। পদচুম্বন করলেন। আর বললেন: যারা আপনাদেরকে হত্যা করেছে তাদের সাথে আমি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। আর ইমাম জয়নুল আবিদীনের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ যে অশোভনোক্তি করেছিলেন তার জন্য ক্ষমাচাইলেন। এজিদের নিকট এ খবর পৌছলে এজিদ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করার হুকুম জারী করল।[৪]

দুঃখের বিষয় বনু উমাইয়্যারা সর্বদা আলে রাসূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লেগে থাকে। আর তাদের নিজেদের ভূয়া ফযীলত জনতার মধ্যে প্রচার করতে থাকে। যাতে কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়। আর এরূপ অপপ্রচারের ভিত্তিমূলে উমাইয়্যাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তা টিকিয়ে রাখার জন্যই তারা এইসব করে নির্দ্বিধায়।

সূত্র সূচী ঃ

১· আল্ মুন্তাখাব ঃ তোরাইহী প্রণীত ঃ ৩৩৯ পৃষ্ঠা। মাক্তালুল হোসাইনঃ আব্দুর রাজ্জাক আল্ মুকরিম প্রণিতঃ ৪৪২ পৃষ্ঠা। আল্ ইসাবাঃ তৃতীয় খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা। তাবারী ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা। ইবনুল আসীর ঃ ৪র্থ খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা। আল্বিদায়া ঃ ৮ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা।

২· রূহুল মাআনীঃ ২৫ খন্ড, ৭৩ পৃষ্ঠাঃ আয়াতঃ

فهل عسيتم ان توليتم -

৩· শরহে আকাইদ নাসাফী ঃ ১৬৩ পৃষ্ঠা। রূহুল মাআনী ঃ ২৫ খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা। মাকতালে হোসাইন ঃ আব্দুর রাজ্জাক প্রণীত ঃ ৪৪৮ পৃষ্ঠা।

৪· তাফসীর ইবনু কাসীরঃ ৪র্থ খন্ড ১১২ পৃষ্ঠা, রূহুল্ মাআনী ঃ ২৫ খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মাক্তালে হোসাইন ৪৪৯ পৃষ্ঠা।

হযরত যায়নাবের বিলাপ

লুণ্ঠিত নবী পরিবারের কাফেলা যখন রওয়ানা করা হয় তখন কারবালার যুদ্ধক্ষেত্র দিয়ে তাঁরা যাচ্ছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইনের বোন হযরত যায়নাব (রঃ) শহীদ ইমামের ক্ষতবিক্ষত লাশ মোবারক করুণ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে হাহাকার করে উঠলেন। আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে যা বলেছিলেন আল্লামা ইবনু কাসীর তাও উল্লেখ করেছেনঃ

فلما مروا بمكان المعركة ورآوا الحسين واصحابه مطروحين هنالك بكته النساء وصرخن وندبت زينب اخاه الحسين واهلها فقالت وهى تبكى :

يامحمدها يامحمداه صلى عليك الله وملك السمآء هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء - يامحمداه وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفى عليها الصبا -

قال (الراوى) فابكت والله كل عدو وصديق -

(البدايه النهايه ج٧ ص١٩٣)

--তাঁরা যখন যুদ্ধক্ষেত্র অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তথায় হযরত হোসাইন ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের লাশ পড়ে থাকতে দেখলেন। এ দৃশ্য দেখে মহিলারা ইমাম হোসাইনের জন্য শোক প্রকাশ করে কেঁদে ফেললেন। তাঁদের কান্নার রোল উঠল। হযরত যায়নাব তাঁর ভাই ইমাম হোসাইন ও তাঁর পরিবারের শোকে বিলাপ করে কেঁদে কেঁদে বল্লেনঃ

"হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আসমানের ফেরেশতারা তোমার কল্যাণ কামী হোক! এই হোসাইন উন্মুক্ত মাঠে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তিত। হে মুহাম্মদ! আজ তোমার মেয়েরা যুদ্ধবন্দী, তোমার সন্তানেরা নিহত, তাদের উপর প্রাতঃ বায়ূ ধূলি নিক্ষেপ করছে।"

ঘটনা বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, হযরত যায়নাব শত্রুমিত্র সবাইকে কাঁদিয়ে ফেললেন।"

আল্ বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ৭ম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা

হযরত যায়নাবের এ বিলাপ গাথায় এজিদ বাহিনীর পৈশাচিক আচরণের প্রকাশ পায়। ইমাম হোসাইনকে শহীদ করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাঁর লাশের উপর দিয়ে অশ্ব বাহিনী দাবড়িয়ে দিয়ে হযরত শহীদ ইমামের লাশ মোবারক কে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এ অবস্থায় হযরত যায়নাব তাঁর ভ্রাতার খন্ডিত দেহ দেখে কেঁদে বুক ফাটিয়েছেন। যারপর নেই শোক প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইনকে প্রতি অঙ্গে নেকীদান করুন। আর তাঁকে অনুসরণ করে ইসলামের জন্য শহীদ হওয়ার চেতনার উন্মেষ ঘটুক এটাই কামনা করি।

সংগ্রামের পথে ইমাম হোসাইন

اما امام حسین یکی ازسه کاررا باید بکند (۱) یابیعت کند تسلیم شود (۲) یا آنطوری که بعض پیشنهاد کردند بیعت نکند ..... خودش رابه کناری بکشد به درهای یادامنهء کوهی پناه ببرد - (۳) یاایستادگی کند تاکشته شود - وسوم راهی بود که خودش انتخاب کرد - (مرتضی مطهری)

—ইমাম হোসাইনের সামনে তিনটি পথ খোলা ছিলঃ

১) এজিদের হাতে বায়আত করে আত্ম সমর্পণ করা

২) বায়আত না করে কোন উপত্যকায় বা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে ঝামেলা মুক্ত থাকা।

(৩) সংগ্রাম করে মৃত্যুবরণ করা। ইমাম হোসাইন তৃতীয় পথটি বেছে নিলেন।

'আল্লামা মুর্তাযা মুতাহহারী

حماسه حسینی : ج۳ ص۳۵)

ইমাম হোসাইন ও মুফতী মোহাম্মদ শফী

آخر میں پھر اس کلام کا اعادہ کرتا ہوں جو اس کتاب کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ حب اهل بیت اطہار جزو ایمان ہے ان پر وحشیانہ مظالم کی داستان بھلانے کے قابل نہیں- حضرت حسین (رض) اور ان کے رفقاء کی مظلومانہ اور دردانگیز شہادت کا واقعہ جس کے دل میں رنج وغم اور درد پیدا نہ کرے وہ مسلمان کیا انسان بھی نہیں -

(شہید کربلا ۱.۸)

– "সর্বশেষে পুনরায় সে কথা ব্যক্ত করব যে কথা এ পুস্তিকার শুরুতে লিখেছি যে, পবিত্র আহলে বাইতগণের মহব্বত ঈমানের অংশবিশেষ। আর তাঁদের প্রতিকৃত পশু শুলভ অত্যাচারের কাহিনী ভুলে যাওয়ার মত নয়। হযরত হোসাইন এবং তাঁর সাথীদের ব্যথাতুর নিপীড়নমূলক ঘটনা যার অন্তরে ব্যথা ও শোক এবং বেদনা সৃষ্টি করে না, সে মুসলমান তো নয়ই, মানুষের নামেরও অযোগ্য।[১]

حقیقی ہمدردی اور محبت یہ ہے کہ جس مقصد عظیم کے لیئے انہوں نے یہ قربانی دی اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اپنی اپنی ہمت کے مطابق ایثارو قربانی پیش کریں ان کے اخلاق واعمال کی پروی کو سعادت دنیا وآخرت سمجھیں -

(شہید کربلا ۱.۸)

–প্রকৃত সমবেদনা ও মহব্বত হল, যে উদ্দেশ্যে তিনি প্রাণদান করেছেন নিজ নিজ সাধ্যমত সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য ত্যাগ ও আত্মাহুতি দেয়া তাঁর চরিত্র ও কার্যাবলীর অনুকরণ করাকে দুনিয়াও আখিরাতের জন্য কল্যাণময় বলে বিশ্বাস করা।[২]

উস্তাদে মুহতারাম মুফ্তী মোঃ শফী (রঃ) আসল কাজ না করে মিথ্যা হাংগামা

সৃষ্টি করাকে ইমাম হেসাইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উপায় নয় বলে উল্লেখ করেন। কার্যত তিনি ইমাম হোসাইনের আদর্শে চরিত্রবান হতে বলেন। এবং তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার আহবান জানান। এ পথে সাধ্যমত জান–মালের কুরবানী করার জন্য তিনি আহবান জানিয়েছেন।

ইমাম হোসাইনের হত্যাকারীদের পরিণাম

امام زهری فرماتے هین که جولوگ قتل حسین مین شریك تهے ان مین سے ایك بهی نهین بچا، جن کو آخرت سے پهلے دنیا مین شزانه ملی هو- کوئ قتل کیاگیا کسی کا چهره سخت سیاه هوگیا، یامسخ هوگیا - یاچندهی روز مین ملك وسلطنت چهن گئے اور ظاهر هے که یه انکے اعمال کی اصلی سزا نهین بلکه اس کا ایك نمونه هے جو لوگون کی عبرت کے لیئے دنیا مین دکها دیا گیاهے - (شهید کربلا ۱.۱)

––ইমাম যোহরী বলেছেন ঃ যারা ইমাম হোসাইনের হত্যায় অংশ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ রক্ষা পায়নি। তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার আখিরাতের পূর্বেই এ দুনিয়ায় সাজা হয়নি। কাউকে হত্যা করা হয়েছে। কারো মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। কারো চেহারা বিকৃত হয়েছে। কারো অল্প দিনের মধ্যে রাজ্য হারাতে হয়েছে। বলা বাহুল্য এসব তাদের কর্মের আসল সাজা ছিল। তার নমুনা ছিল না মাত্র। মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য তার প্রকাশ ঘটেছে।[৩]

একজন অন্ধ হয়ে যায়

সিবত ইবনু জাওযী বর্ণনা করেছেনঃ একবৃদ্ধ ব্যক্তি হযরত ইমাম হোসাইনের হত্যায় শরীক ছিল। হঠাৎ একদিন লোকটি অন্ধ হয়ে যায়। লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে বৃদ্ধ বললঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখি যে তিনি হাতের কাপড় ঘুটিয়ে আছেন। তাঁর হাতে তলোয়ার। আর সামনে মানুষ খুন করার জন্য যে বস্ত্র বিছানো হয় তা বিছনো। সেখানে হযরত –হোসাইনকে কতলকারী দশজনের জবাই করা লাশ পড়ে রয়েছে। অতপর তিনি আমাকে ধমক দিলেন। আর হোসাইনের রক্তে মাখা একটি শলাকা আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন। সকালে উঠে দেখি আমার চোখ অন্ধ। [৪]

মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল

সিবত ইবনু জাউযী আরও বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি হযরত ইমাম হোসাইনের খন্ডিত মস্তক ঘোড়ার গলায় লটকিয়ে রেখেছিল, পরে দেখা গেল তার মুখ কাল আল্ কাতরার রং ধারণ করেছে। লোকেরা তাকে প্রশ্ন করল; তুমিতো সমস্ত আরবে সুন্দর চেহারার মানুষছিলে তোমার এ অবস্থাকেন? সে বলল যেদিন আমি এ মস্তক ঘোড়ার গলায় লটকাই সেদিন থেকে একটু ঘুমালেই দু ব্যক্তি এসে আমার দু বাহু ধরে জ্বলন্ত আগুনে নিয়া যায়। আমাকে তারা আগুনে ফেলে দেয়। আগুনে পুড়ে আমার এদশা হয়েছে। কিছুদিন পর লোকটি মারা যায়। [৫]

আগুন লেগে ভস্ম

ইবনু জাউযী (রঃ) আরও উল্লেখ করেন যে, প্রসিদ্ধ তাফ্সীরকার সুদ্দী বলেন, তিনি একদিন লোকজনকে দাওয়াত করেন। মজলিসে আলোচিত হল যে, যারা ইমাম হোসাইনের হত্যাকান্ডে শরীক ছিল দুনিয়াতে তাদের শাস্তি হয়ে গেছে। এক ব্যক্তিবলল এটা একেবারে মিথ্যা কথা। সে নিজে ইমাম হোসাইনের হত্যায় জড়িত ছিল। তার কিছুই হয়নি। লোকটি মজলিস থেকে উঠে বাড়ীতে পৌছায়। তার প্রদীপ জ্বালাবার চেষ্টা করে। প্রদীপের শলতা ঠিক করতে গিয়ে তার কাপড়ে আগুন লেগে যায়। সে আগুনে লোকটি জ্বলে কয়লা হয়ে যায়। সুদ্দী নিজে সকালবেলা খবর পেয়ে তাকে দেখতে যান। তিনি দেখতে পান যে কালো হয়ে গেছে। [৬]

আমাদের দেশে যারা এজিদের সাফাই গেয়ে বেড়ান তাদের বিষয়টি লক্ষ্য করতে বলি। এসব কথা কোন শিয়া কিতাবে লেখা হয়নি। সুন্নী আলেমগণ চোখে দেখা ঘটনা বলেছেন। কাজেই এজিদকে সমর্থন করার দুঃসাহস দেখাবেন না। –এর ফলে এ যুগের এজিদ পন্থীরাও আযাবের মুখোমুখি হতে পারেন।

تیر مارنے والا پیاس سے تڑپ تڑپ کرمرگیا –

"ইমাম হোসাইনের প্রতি তীর নিক্ষেপকারী পানির পিপাসায় কাতরাতে কতরাতে প্রাণত্যাগ করেছে।" মুফ্তি সাহেব মরহুম এ শিরোনামের আওতায় যা উল্লেখ করেছেন বিস্তারিত ভাবে আমরা পূর্বে তা বর্ণনা করে এসেছি। খোদ এজিদ বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি। রাজ্য ছেড়ে পরপারের পথ ধরে। উবায়দুল্লা ইবনু যিয়াদ শত্রুর হাতে নিহত হয়। হোসাইন নিধনের পাপের প্রায়শ্চিত্য সবাইকে করতে হয়েছে।

মুখতারের কূফা দখল এবং হোসাইন হন্তাদের মৃত্যুদন্ড

এ শিরোনামে মুফ্তী সাহেব মরহুম লিখেছেন ঃ

قاتلان حسین پر طرح طرح کی آفت ارضی وسماوی کاسلسله

توتهاهی واقعه شهادت سے پانچ سال بعد ٦٦ مین مختارنے قاتلان حسین رض سے قصاص لینے کا اراده ظاهرکیا تو عام مسلمان اس کے ساته هوگئے اور تهوڑے عرصه مین اس کو یه قوت حاصل هو گئ که کوفه اور عراق پر اس کا تسلط هو گیا – اس نے اعلان عام کر دیا که قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتاهے اور قاتلان حسین رض کی تفتیش وتلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایك ایك کوگرفتار کرکے قتل کیا – ایك روز مین دوسو ارتایس ٢٤٨ آدمی اس جرم مین قتل کئے گئے که وه قتل حسین مین شریك تهے اس کے بعد خاص لوگون کی تلاش وگرفتاری شروع هوگئ –

(شهید کر بلا ص١٠٤)

–হোসাইন হন্তাদের উপর নানা ধরনের দুনিয়াবী ও আসমানী বালা মুসীবত একাধারে আসতে থাকে। শাহাদাতের ঘটনা ঘটার পাঁচ বছর পর ৬৬ হিজরী সালে মুখতার সাকাফী এসে হোসাইন হন্তাদের নিকট হতে কিসাস গ্রহণের ডাক দেয়। সাধারণ মুসলমানেরা তার ডাকে সাড়া দেয়। অল্পদিনের মধ্যে সে বিরাট শক্তি অর্জন করে। কূফা ও ইরাকে তার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সে সাধারণক্ষমা ঘোষণা করে বলে যে, হোসাইন হন্ত্যাকারীদের ছাড়া সবাইকে সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত করা হল। সে হোসাইন হন্ত্যাকারীদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে একএক জনকে ধরে ধরে হত্যা করে। এক এক দিন গড়ে ২৪৮ জনকে মুখতার ধরে এনে হত্যা করেছে। এরপর পলায়নরত বিশেষ বিশেষ দাগীলোকজনকে ধরে আনে। আর প্রাণ দন্ডদেয়। নিম্নে তার বিবরণ দেয়া হলঃ

আমর ইবনু হাজ্জাজ ঃ পিপাসার্ত অবস্থায় উত্তপ্ত লু বায়ুতে পলায়ন করতে গিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। তাকে লোকেরা ধরে জবাই করে ফেলে।

শিমারঃ কেধরে এনে হত্যা করেতার গোশ্ত কুকুর দ্বারা খাইয়ে দেয়া হয়।

আবদুল্লাহ ইবনু উসাইদ ঃ মালিক ইবনু বশীরঃ হামল ইবনু মালিকঃ প্রমুখকে ঘেরাও করা হয়। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুখতার বলে ঃ অ–জালিমরা। তোরা ইমাম হোসাইনের প্রতি দয়া দেখাতে পারলিনা, তোদের আবার ক্ষমা কিসের? তাদেরকে ধরে এনে হত্যা করে। মালিক ইবনু বশীর ইমাম হোসাইনের টুপি নিয়ে যায়। তার উভয় হাতও পা কেটে ময়দানে ফেলে রাখা হয়। সেখানে সে তড়পাতে তড়পাতে মারা যায়।

উসমান ইবনু খালিদ ঃ বিশর ইবনু শুমহিতঃ হযরত মুসলিম ইবনু আকীলের হত্যাকান্ডে সহযোগিতা করে ছিল। তাদেরকে হত্যা করে লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়।

উমর ইবনু সাদ ঃ এজিদ বাহিনীর সেনাপতি ছিল। তাকে ধরে এনে হত্যা করা হয। পূর্বেই তার ছেলে হাফসাকে ধরে অনা হয়। উমর ইবনু সাদের শির তার সামনে দিয়ে বলা হয় একে চিন? হাফস বলে যে হাঁ চিনি। আমিও তারপর জীবিত থাকতে চাইনা। তাকেও হত্যা করা হয়। মুখতার তাদেরকে হত্যা করে বলে যে, চারভাগের তিন ভাগ কোরাইশকে হত্যাকরলেও ইমাম হোসাইনের একটি আঙ্গুলের বদলা চুকানো যাবেনা।

হাকীম ইবনু তোফায়ল ঃ হযরত ইমাম হোসাইনের প্রতি তীর মেরেছিল। তাকে এনে তীর মেরে মেরে হালাক করা হয়।

যায়েদ ইবনু রিফাদ ঃ হযরত হোসাইনের ভাতিজা এবং মুসলিম ইবনু আকীলের ছেলে আব্দুল্লাকে তীর মেরে শহীদ করে। কপালেতীর লাগার পর হাতদিয়ে তিনি কপাল রক্ষা করার চেষ্টা করলে নরাধম পুনরায় তীর মেরে তাঁর হাত কপালের সাথে গেঁথে ফেলেছিল। পূর্বে আমরা ও তা বর্ণনা করেছি। তাকে ধরে এনে তার প্রতি তীর ও পাথর ছুঁড়ে মারা হয়। পরে প্রাণ থাকতেই তাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

সিনান ইবনু আনাস ঃ সে কুফাছেড়ে পলায়ন করে। মুখতার তারবাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়। হযরত উস্তাদ মুফতী সাহেব কেবলা তাঁর রচিত শহীদে কারবালা পুস্তিকায় সে সব বর্ণনা করে বলেন ঃ

قاتلان حسین کا یہ عبرتناك انجام دیکھکر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے - كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُوْنَ -

হোসাইনের এই হন্তাদের ভয়াবহ পরিণতি দেখে অবলীলাক্রমে মুখে এসে যায় কুরআনের আয়াতটি যাতে বলা হয়েছে ঃ

"শাস্তি এমনিই হয়ে থাকে। তবে আখেরাতের শাস্তি আরো কঠিন, যদি তারা জানতো।"

সূত্র সূচী ঃ

১· শহীদে কারবালা ঃ মুফতী মোঃ শফী (রঃ) ১০৮ পৃষ্ঠা।
২· ঐ ঐ ১০৮ "
৩· ঐ ঐ ১০১ "
৪· ঐ ঐ ১০২ "
৫· ঐ ঐ ১০২ "
৬· ঐ ঐ ১০৪ "
৭· ঐ ঐ ১০২ "
৮ ঐ ঐ ১০৫ "

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রঃ)—এর দৃষ্টিতে ইমাম হোসাইন (রাঃ)

আমরা আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। বলার অনেক কিছু রয়েছে।সমাপ্তি পর্বে ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের মূল্যায়ন বিখ্যাত সুফী সাধক আল্লাহর অলী খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (রঃ) ইমাম হোসাইন সম্পর্কে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। তিনি ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের নির্যাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

شاه است حسين بادشاه است حسين -

دين است حسين، دين پناه است حسين،

سرداد نه داد دست در دست يزيد ،

حقاكه بناء لا اله است حسين،

خواجه معين الدين اجميرى -

"হোসাইন সৈয়দ বংশে উদ্ভূত দ্বীনের কর্ণধার বাদশাহ তুল্য তিনি, দ্বীন বলতে হোসাইনকে বুঝায়, তিনি হলেন দ্বীনের আশ্রয়। শির উৎসর্গ করলেন। কিন্তু বাইআত করলেন না এজিদের হাতে। তাই ন্যায়ত বলা যায়, হোসাইন লা-ইলাহা কালিমার ভিত্তিমূল।"

সত্য বলতে কি? ইমাম হোসাইনের (আঃ) কোনো সমকক্ষ ছিল না। তিনি ছিলেন নিজেই নিজের সমতুল্য। তিনি অকুতোভয়ে তখন সংগ্রামে অবতীর্ণ না হলে আজ ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ বিলুপ্ত হয়ে যেত। ইসলামী খেলাফত ও খলীফা নির্বাচনের ইসলামী বিধান কি তা খুঁজে পাওয়া যেত না। অন্যায় অন্যায়ই। তাযে কোন শক্তিশালী বীরের হাতে সাধিত হোক। অন্যায়ের সামনে আত্মসমর্পন করা যাবে না। এ শিক্ষা ও এর প্রেরণা ইমাম হোসাইনের চরম ত্যাগের মধ্যে নিহিত। অন্যদিকে ইমাম হোসাইনের জন্য বিলাপ করে কর্তব্য শেষ করে দেয়া যাবে না। তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর ন্যায় নির্ভীকচিত্তে আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে ভূখণ্ডে অন্যায় দানা বেঁধে উঠে সেটাই কারবালা। আর যেদিনই জালিমের হাতে ন্যায়ের সৈনিকের রক্ত ঝরবে সেদিনটিই আশুরার দিন তথা মহররমের দশ তারিখ ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের দিন। তাই ইমাম খোমেনী হোসাইনের সংগ্রামের ব্যাপক অর্থ উদ্ধার করে বলেছেন ঃ সমস্ত পৃথিবীটাই কারবালা এবং সকল দিনই আশুরার দিন।

كل ارض كربلا وكل يوم عاشوراء -

এ কথাটি ইমাম জাফর সাদেক ও বলেছেন।

উপসংহারে আমরা শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি। আমাদেরও আমাদের নতুন প্রজন্মের দিলে ইমাম হোসাইনের দৃঢ়তা এবং আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তার একনিষ্ঠ সংগ্রাম ও সাধনার পুনরাবর্তন কামনা করি। ওয়াল্লাহুল মুস্তাআনু আলা মা তাসিফূন।।

—০ সমাপ্ত ০—